শাড়ী বাড়ী গাড়ী

আবু রুশদ

শাড়ী বাড়ী গাড়ী

শাড়ী বাড়ী গাড়ী

আবু রুশ্‌দ্‌
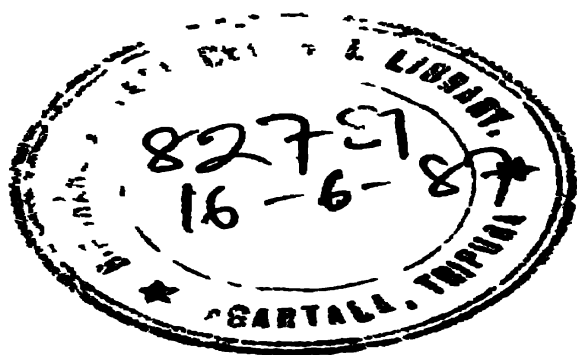
"বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বি. সি. আই. সি.-এর খুলনা নিউজপ্রিণ্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত।"

মুক্তধারা

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্ব: পুথিঘর লি:]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা-১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী : হাশেম খান
মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা-১
বাংলাদেশ

SHARI BARI GARI
[Short Stories]
By Abu Rushd

Cover Design : Hashem Khan
Publisher : C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj Dhaka-1
Bangladesh

ইজাবুদ্দীন আহমদ
বন্ধুকে

দাহন

এক এক করে উপযাচকের দল আসতে লাগলো। তাদের কলরবেই, ট্রেন ছাড়বার প্রায় আধ ঘণ্টা আগে, মফঃস্বল ষ্টেশনের স্বভাবতঃ অপচল প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠলো।

বয়সের কোনো সীমা এই দলে দেখা যায় না। কেউ সুবেশধারী, সপ্রতিভ, ব্যঙ্গ-নিপুণ নবীন যুবা; দু'একজন স্ফীতকায়, পুরনো ঢিলে-ঢোলা পোষাক পরা, বিশুষ্ক-চাউনীতে অনুজ্জ্বল প্রৌঢ়। বেশীর ভাগই চল্লিশ পেরুনো, স্বচ্ছলতায় মসৃণ, স্ফীতোদর উচ্চ কর্মচারীর দল।

বয়স, পদমর্যাদা ও চেহারায় এদের মধ্যে বিশেষ কোনো মিল না থাকলেও, সকলেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে, নিজেদের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি উচ্চারিত করে এই অখ্যাত জেলা শহরের ষ্টেশন প্রাঙ্গণে এসে হাজির হয়েছে।

শীতকালের দুপুর বেলার নির্মল রোদ আর আকস্মিক তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা বাতাসের খোঁচা কারও মনে সুখ এনেছে, কারও শরীর কাঁপাচ্ছে। আদিগন্ত প্রসারী আসমানে চিলের সদর্প বিহার।

উপযাচকদের মধ্যে বয়সে যিনি প্রবীণতম, স্ফীতিতেও তিনি বিশালতম। নাম: খালেক সাহেব; পেশা: সরকারী ওকালতি। অবসর গ্রহণের মুখে এসে তাঁর মুখে সব সময়ই দুশ্চিন্তার দু'একটা ভাঁজ দেখা যায়। সেটা ঢাকতে গিয়ে তিনি পার্থিব সমস্ত কামনার

ঊর্ধ্বে এমন এক ভঙ্গী গত দুই বছর ধরে রপ্ত করবার অবিরাম চেষ্টা করে আসছেন।

বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে: রিটায়ার করে কি করবে কিছু ভেবেছো? তোমার তো ওকালতির অভিজ্ঞতা আছে, সহজেই রাজনীতি করতে পারো। শীগগীরই হয়তো মন্ত্রী হয়ে যাবে। এই ধরো-না আমাদের বন্ধু রহমান সাহেবের কথা। সেও তো উকিল ছিলো, উকিল হিসেবে এমন কিছু ভালোও না। দেখ দেখি এখন কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সচিব হয়ে গেছে।

বন্ধুর কথাগুলির মধ্যে কতটা আন্তরিকতা ও কতটা খোঁচা তা খালেক সাহেব চট্ করে ঠাহর করে উঠতে পারলেন না। তিনি নিজেই বোঝেন উকিল হিসেবে তিনি কখনও তেমন অসাধারণ ছিলেন না। তাই বন্ধু হয়তো এক ঢিলে দুই পাখীই মেরে বসলো।

বাইরে অবশ্য বলেন, বন্ধুর সামনেও নিরাশক্তির এক মুখোশ পরে: আরে ভাই, তুমি পাগল হয়েছো, আমাদের দেশের রাজনীতির কথা তো তুমি জানোই। কি নোংরামি। আর বকবক করতে করতেই তো জীবনটা প্রায় কাটিয়ে দিলাম। এখন কিছু নিজের মনকে যাচাই করি, কিছু পড়ি, জানোই তো ইতিহাসে আমার অনেক দিনের আগ্রহ। বন্ধু কি বুঝলেন তিনিই শুধু জানলেন, বাইরে শুধু স্মিত হাসলেন।

অথচ খুবই একটা পার্থিব উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি রহমান সাহেবকে ঘটা করে বিদায় দিতে এসেছেন। তিনি শুনেছেন রহমান সাহেবের হাতে ঢাকার শিক্ষা-সংক্রান্ত কোনো এক ভালো চাকরী আছে। সেটাই বন্ধুর কাছে তিনি দাবী করতে এসেছেন, ইতিহাসে তাঁর বরাবর আগ্রহ আছে সেই অকাট্য যুক্তিতে।

নিজের জন্য ততটা নয়, একমাত্র বাউণ্ডুলে ছেলের কথা ভেবে যতটা। ছেলেটা পড়াশুনা করলো না। কাপ্তানী করেই জীবনটা বরবাদ করে দিলো। পঁচিশ বছর বয়সে এখন ক্রিকেট খেলায় মেতেছে বাপ থেকে

সব রকমের রসদ জোগাড় ক'রে। পয়সা দিতে গাফলতি করলে বাপ সম্বন্ধে মন্তব্য করে : গাড়ল।

প্লাটফর্ম-এ বিচরণ করতে করতে হঠাৎ কখনও সেই হালার কথা খালেক সাহেবের তীব্রভাবে মনে পড়ে যায়। তখন এই উপযাচকের মনোবৃত্তি তাঁর নিজের কাছেই কেমন অবাস্তব মনে হয় আর সেই ডামাডোলে পড়ে খালেক সাহেব তাঁর বির্কর্ণ টাইটি স্থানভ্রষ্ট হলো কি না, তা তাঁর মোটা আঙুল দিয়ে পরখ করেন।

মাঝবয়সীদের ভেতর সবচেয়ে ছিমছাম ও বিন্যাস-পটু যিনি, তিনি হচ্ছেন স্কুলের সহকারী ডিভিশনাল ইনস্পেক্টর। নাম, শফিক আহমদ। স্বাধীনতার আগে সরকারী স্কুলের সহশিক্ষক ছিলেন। তখন ইংরেজী পড়াতে গিয়ে 'সে আত্মহত্যা করিয়াছিল' তার অনুবাদ করতেন : He suicided

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর প্রধান ব্রত দাঁড়িয়েছিলো উপরি-ওয়ালাদের খুশী করে কি করে নিজের পদোন্নতি করা যায়। আর দরকার হলে বড় কর্তাদের বাজার-সরকারি পর্যন্ত করে তার সে মানতও পুরো হয়েছিলো দু'বার। একবার সহকারী প্রধান শিক্ষক হয়ে; আর একবার জিলা ইনস্পেক্টর। এখন জিলা ইনস্পেক্টরদের মধ্যে সিনিয়র হওয়ার দরুন সহকারী ডিভিশনাল ইনস্পেক্টর-এর পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

শফিক সাহেবের গুণগরিমার কথা স্বামীর সঙ্গে এখানে আসবার আগেই বেগম রহমান শুনেছিলেন। তাই এখানে তাঁদের তিন বেলারই খানাপিনার আয়োজন মৃদু ইঙ্গিত দিয়ে বেগম সাহেবা শফিক সাহেবের মারফৎ করাতে পেরেছিলেন। শুধু তা-ই নয়। ঢাকার তাঁর মেজ-বোন, ডেপুটি-গিন্নি অনুরোধ জানিয়েছিলেন : রহমান সাহেবরা কোলকাতার যখন এত কাছাকাছি যাচ্ছেন তখন একটা জি-ই-সি বা মার্কা ইস্ত্রির খোঁজ যেন তাঁরা করে আসেন। মেজ-বোনের এই অনুরোধ রাখবার

চেষ্টা বেগম রহমানকে করতেই হয়। তাই শফিক সাহেবকে ডেকে পাঠিয়ে সমস্যাটি বেগম সাহেবা তাঁকে বেশ স্বচ্ছতার সঙ্গে বুঝিয়ে দেন আর সমাধানের ভার শফিক সাহেবের উপর ছেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ত্বরিতকর্মা শফিক সাহেবের পক্ষে জি-ই-সি ইস্ত্রি জোগাড় করা এমন কোনো দুরূহ ব্যাপার হয়নি—যদিও তখন বোনকে নিয়ে তাঁর ঘরে বেজায় অশান্তি। বোন প্রেম করে এক কলেজের ছোকরার সঙ্গে বেরিয়ে তিন-চারদিন উধাও থেকে এক অঘটন বাধিয়ে তবে ঘরে ফিরেছে। এখন বিয়েটা দিতে না পারলে কেলেঙ্কারীর কোনো শেষ থাকবে না।

তবে বাইরের আচরণে নিজের দুশ্চিন্তাকে অপরের সামনে তুলে ধরার বান্দা শফিক সাহেব নন। তাই ইস্ত্রির ব্যাপারে তাঁর অধস্তন এক হিন্দু কর্মচারী তখুনি জরুরী এক নির্দেশ পায় আর সীমান্তের ব্যবধান তুচ্ছ করে চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরেই এক জি-ই-সি ইস্ত্রি নিয়ে হাজির হয়। ট্রেন ভাড়াটা শফিক সাহেবই দিয়েছিলেন তবে ইস্ত্রি বাবদ বেগম সাহেবার কাছে তিনি কিছু চান নি বা পাওয়ারও আভাস পান নি।

তা এত সব শফিক সাহেব কি শুধু খামাখাই করেছেন। বেগম রহমানকে তিনি বলে রেখেছেন, রহমান সাহেব যদি শুধু একটু ইঙ্গিত দেন তবে ঢাকার ডিভিশনাল ইনস্পেক্টর হয়ে তাঁর পদোন্নতি ঠেকায় কে। ঢাকায় থাকলে শফিক সাহেব রহমান সাহেবের আরও কাজে লাগতে পারবেন।

সে কথাই আর একবার মনে করাতে শফিক সাহেব ষ্টেশনে এসেছেন। তাঁর পরনের সব কিছুই, বাদামী রঙ-এর স্যুট থেকে কমলা রঙ্-এর সিল্কের মোজা আনকোরা তিনি কোলকাতা থেকে আনিয়েছেন। জুতোটা পালিশে ঝকমক করেছে—কি ভাবে ধুলো বাঁচিয়ে চলতে হয় সেটা শফিক সাহেবের মতো আর কেউ মসক্ করতে পারে নি।

উপযাচকদের মধ্যে বয়সে যে নবীনতম তার নাম মাহমুদ।

বিভাগোত্তর ডেপুটি। পরণে ব্লু সার্জ-এর স্যুট। গাঢ় লাল এক টাই। ছাই রঙ-এর সোয়েড-এর জুতো আর কোটের উপরের পকেটে বেগুনী রঙ-এর সিল্কের এক রুমাল। সর্দিতে ভেজা নাকের দু' একটা রুঠা-লাল লোম বেরিয়ে থাকার দরুন তার ছিমছাম ভাব যেন কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। দামী জুতোও ধূলিতে ভরে ম্লান হয়ে গেছে। কোনো এক জায়-গায় বেশীক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারছে না। কখনও বুকষ্টল-এ গিয়ে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট দৃষ্টিতে রঙীন মলাটগুলোর দিকে চেয়ে কিছু না কিনেই ঝটিতি গতিতে ওখান থেকে সরে যায়। তারপর কোটের পকেট থেকে গোল্ডফ্লেক সিগ্রেটের বাক্স হেঁচড়ে টেনে একটা সিগ্রেট বের করে অধৈর্য ক্ষিপ্রতায় দেশলাইয়ের এক কাঠি জ্বালে আর বড় বড় টান দিয়ে যতটা পারে সিগ্রেটের ধোঁয়া—তার কাছে উন্মাদনার সরু জাল বলে মনে হয়—বুকের ভেতর টেনে নেয়।

তাতেও যখন সময় কাটতে চায় না তখন বড় থপথপে পা ফেলে পানওয়ালার দিকে এগিয়ে একটা সাচি পান কিনে তখুনি তা মুখে ভরাট করে পুরে দেয়। প্লাটফর্মের সিমেন্টের অঙ্গনে মাহমুদের দ্রুত অশান্ত পদক্ষেপের প্রতিধ্বনিতে রোদে-ঝিমুনো এক নেড়ী কুকুর সচকিত হয়ে তার উত্তপ্ত আরাম পরিহার করে কর্কশ ধ্বনি তোলে আর সেই কর্কশ ধ্বনি শুনে আশে পাশের গাছে কয়েকটা পাখী জিরুবার লোভ ছেড়ে আকাশের মুক্ত অঙ্গনে নিরাপত্তার আশ্বাস খোঁজা আরম্ভ করে দেয়।

মাহমুদও এসেছে বিশেষ এক তালে। রহমান সাহেব, মাহমুদ জানতে পেরেছে, নিজের জন্য এক প্রাইভেট সেক্রেটারী তালাশ করছেন। এখন যে প্রাইভেট-সেক্রেটারীর কাজ করছে বিপক্ষ দলের লোক বলে তার প্রতি রহমান সাহেবের তেমন কোনো আস্থা নেই। আর প্রাইভেট সেক্রেটারী নিজের এক পেয়ারের লোক না হলে চলে!

মাহমুদ রহমান সাহেবের সেই পেয়ারের লোক হতে চায়। বেগম

সাহেবারও এ-ব্যাপারে বিশেষ গরজ দেখা যায়। বর্তমান প্রাচুর্যে তিনি অভাব-ম্লান অতীতের কথা তোলেন নি। অতএব মন্ত্রিত্ববিহীন ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়। নীরব নৈপুণ্যে বেগম সাহেবা ভবিষ্যতের সংস্থান, এর মধ্যে বেশ কিছু করে নিয়েছেন। এই ফাঁকে জামাই-পর্বটাও যদি সেরে নেওয়া যায় তবে সোনায় সোহাগা। মাহমুদ সেই সোহাগা হতে পারে।

মাহমুদের নিজের ধারণা অবশ্য কিছুটা অন্যরকম। যাই তো একবার করাচী কোনোমতে—তারপর ওখানকার বাজার যাচাই করে দেখা যাবে। অনেক কিছু ভেবে চিন্তে মাহমুদ এখনও বিয়ে করেনি। ভালো চাকুরের পক্ষে কুমারত্ব মস্ত এক মূলধন। সেই মই-এ পা দিয়ে ধাপের পর ধাপ অনেকটা ওঠা যায়। অবশ্য সতর্কও থাকতে হয়, পা-টা যেন না ফস্কায়।

ললনার ললিত লাবণ্য তার মনকে চকিত নেশায় যে অবশ করে দেয় না তা নয়। এই অখ্যাত শহরেই একজনের সঙ্গে তার কিছুটা আলাপ হয়েছে যার স্মিত ও বিস্তারমুখী সুষমায় তার মন কিছুটা আচ্ছন্ন। এই যে রৌদ্র ঝলকিত প্রান্তরের মধুর অবসাদ, বনানী ও পুকুরের উষ্ণ শোভা, চারদিক্‌কার ছড়ানো বিস্তৃতিতে মুক্তির আশ্চর্য আস্বাদ—এই সবকিছুই সেই মেয়েকে মনে করিয়ে দেয় যার কুণ্ঠিত বিনম্র চাউনি যেন তাপহরণ এক প্রলেপ।

তবে করাচীর ডাকও তো আর উপেক্ষা করা যায় না।

হঠাৎ ত্রস্ত, সচকিত, অসংবদ্ধ কর্মব্যস্ততায় প্লাটফর্ম-এর অঙ্গন মুখর হয়ে উঠলো। এসেছেন, এসেছেন, রহমান সাহেব এসেছেন। দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। কালো ইস্পাতের মতো গঠন, কালো গরম স্যুট-এ বেশ তীক্ষ্ণ-ভাবে উচ্চারিত। হাসিটা কিন্তু অনেকটা বিড়ালের মতো, ইঁদুর ধরবার ঠিক আগেকার মুহূর্তের হাসি। এক হাতে খালেক সাহেবকে আর অন্য হাতে শফীক সাহেবকে বেষ্টন করে তিনি অত্যন্ত মামুলি কথা এমন

অনুশীলিত ভদ্রতার সঙ্গে বলে যান যে, বাকী উপবাচকদের মন তা লক্ষ্য করে তীব্র ঈর্ষায় দংশিত হয়।

মাহমুদ কিন্তু ঠিক জায়গায় গেছে। বেগম সাহেবার কি দরকার সে-দিকে তার সুতীক্ষ্ণ নজর। একবার পানও এনে দিলো। বেগম সাহেবার মাঝবয়সী পাণ্ডুরতা বেশ ও বিন্যাসের ঘটায় যে ঢাকা পড়েনি মাহমুদ সহজেই দেখতে পায়, তবে সে নিজের দৃষ্টিতে এমন এক সূক্ষ্ম ঘোরের সঞ্চার করে যে তা লক্ষ্য করে বেগম সাহেবার দিলটা বেশ খুশ হয়।

শফিক সাহেব মাহমুদের দিকে বারবার আড় চোখে চেয়ে দেখছিলেন। বেগম সাহেবার অনুগ্রহ মাহমুদকে বেহায়াভাবে কুড়োতে দেখে তিনি তখুনি মনস্থির করে ফেলেন।

আচ্ছা, এবার একটু বেগম সাহেবার খোঁজ নিয়ে আসি স্যর, বলে দরাজ হেসে রহমান সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি বেগম সাহেবার দিকে এগিয়ে যান। আর সেই অবসরে বেশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রহমান সাহেবের কাছে খালেক সাহেব নিজের গোপন ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। জিনিসটা তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন (সকলকে, বন্ধু হলেও, শিবের মতো প্রশান্ত নিশ্চয়তায় তিনি এই একই আশ্বাস দেন) বলে খালেক সাহেবকে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

আর একজন নতুন যাত্রী প্লাটফর্ম-এ দেখা দিলো। তাঁকেও কয়েকজন বিদায় দিতে এসেছে। আমিন সাহেব, স্থানীয় কলেজে কুড়ি বছর অর্থনীতি পড়িয়ে ঢাকার কোনো এক কলেজে চাকুরী পেয়ে সেখানে চলেছেন। তাঁর নিজের বিশেষ যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো না। তবে যে ভাতিজাকে তিনি পালেন সে তাঁকে ঢাকা আসবার জন্য খুব করে ধরেছে। ভাতিজা অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে। চাচা সঙ্গে থাকলে পড়াশুনার ব্যাপারে তার সুবিধা, যদিও স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হবে।

রহমান সাহেবকে প্লাটফর্ম-এ দেখে আমিন সাহেব সে-দিকে এগিয়ে

গেলেন। চব্বিশ বছর আগে দু'জনে আনন্দমোহন কলেজে সহপাঠি ছিলেন। তখন দু'জনে বেশ মেলামেশাও ছিলো। সদ্য ওকালতী পাশ করে রহমান সাহেব যখন বিয়ে করেন তখনও মেলামেশার ভাবে ছেদ আসেনি।

তারপর অনেকদিন অবশ্য দু'জনে দেখা হয়নি। পরবর্তী জীবনে রাজনীতির সঙ্গে রহমান সাহেবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা খবরের কাগজ ও বন্ধুদের মারফৎ আমিন সাহেব শুনতে পেতেন তবে তাতে তিনি কোনোদিনই আগ্রহের সন্ধান পান নি। নিজের মহান ব্রতের উন্মাদনায় তাঁর সমস্ত মন আচ্ছন্ন ছিলো। শিক্ষার আলো ছড়াতে হবে ছাত্রদের মনে ; জ্ঞানের বীজ বপন করে তাদেরকে নিষ্ঠা ও চরিত্রের মূল্য শেখাতে হবে, নিজের মনের অনির্বাণ দাহনে তাদের মন জাগাতে হবে।

এই কুড়ি বছর পরে, ব্যর্থতা ও তিক্ততার আস্বাদ পেয়ে, আমিন সাহেবের সে নিশ্চয়তাবোধ আর অটুট নেই। ছাত্ররা এখন মাষ্টারকে শুধু কৃপার দৃষ্টিতে যে দেখে তা নয়, মাষ্টারকে নিয়ে উপহাস করতেও দ্বিধা করে না। একজন ছাত্র তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলো : বেটা যেন লালন ফকির। রহমান সাহেবের কাছে এসে আমিন সাহেব কিছুক্ষণ মন্ত্রী সাহেবের দিকে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে চান। কি বলে সহপাঠিকে সম্বোধন করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত বলেন : তুমি পরশুদিন এখানে যে এসেছো তা জানতাম তবে তুমি খুব ব্যস্ত থাকবে বলে তোমার খোঁজ করি নি, কেমন আছো ?

আশে পাশে উপযাচকদের দলে সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত বদনে আমিন সাহেবকে লক্ষ্য করতে থাকে। কালো আলপাকার জরাজীর্ণ আচকান পরা বেসরকারী মফস্বল কলেজের সামান্য মাষ্টার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সকলের সামনে তুমি বলে সম্বোধন করতে সাহস পায়! বেটার ইজারবন্দ যে আচকানের তলা দিয়ে ঝুলছে সে খেয়ালও নেই।

শফিক-মাহমুদের বিস্ময় উচ্চারিত ব্যঙ্গে পরিণত হয়। সেই শিবের মতো প্রশান্ত বদনে রহমান সাহেব বলেন : চলছে ভাই একরকম। যা ঝক্‌কি এই কাজের, তোমরাই সুখে আছো।

তারপর অস্বস্তিকর স্তব্ধতা।

আমিন সাহেবের দিকে নৈর্ব্যক্তিক এক ধরনে হেসে রহমান সাহেব বেগম সাহেবাকে অনুসরণ করেন। আর অপদস্থ ভাব লুকোতে গিয়ে আমিন সাহেব সম্পূর্ণ সফলকাম হন না। আহত মনে তিনি অতীতের এক ছবি হাতড়াতে থাকেন।

তখন বেগম সাহেবা সপ্তদশী যুবতী। সদ্য বন্ধু-পত্নী হয়েছেন। প্রথম প্রথম আমিন সাহেব যখন তাঁদের ওখানে যেতেন তখন সেই শ্রীময়ী বধূর ধরন-কথন একেবারে অন্য রকমের ছিলো।—আপনি এলেই তো ফট করে চলে যান, আজকে খবরদার সে-রকম করবেন না। এই ফাঁকে আমি একটু ক্ষীর তৈরী করে আনি, ততক্ষণ বন্ধুর কাছে আমার নিন্দে শুনুন।

বন্ধু-পত্নীর সেই নিরাভরণ প্রীতির স্পর্শে আমিন সাহেবের নিজের মনেই তখন ঘর বাঁধবার সাধ জেগেছিলো। এক শ্যামলী শ্রীময়ী মেয়ে তাঁর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর কাশবন ও সর্ষের খেত ও দীঘির সমস্ত শোভা হরণ করে তাঁর কাছে মধুর এক প্রতীক্ষায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর আজকে বন্ধু-পত্নী তাঁকে চিনতেই পারলেন না।

—আপনি চলে যাচ্ছেন, স্যর। আমাদের অর্থনীতি পড়া আর হবে না। গাড়ী ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়বার দু'এক মিনিট পরে আন্তরিকতার সহজ সুরে এক ছাত্র তার মনোবেদনা ব্যক্ত করে।

আমিন সাহেবের ক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত মন নিমেষে আবার নিজের নোঙর খুঁজে পায়, বেগম সাহেবার মতো এক বড় দুর্ঘটাও সে-নোঙরকে আর আল্গা করতে পারে না। ছেলেটার দিকে গভীর কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বলেন : অর্থনীতি পড়া তোমাদের আরও ভালো হবে। আমার

জায়গায় যিনি আসবেন তিনি কত নতুন তথ্য তোমাদের দিতে পারবেন। আমি তো অনেকটা প্রাচীন আর বিকল হয়ে গেছি।

কথাটার অন্তর্হিত কারুণ্যের সবটা ছেলেটির বুঝবার কথা নয়। তবুও চোখের কোণ দু'টি তার সজল হয়ে উঠেছে। তার তরুণ মনে আমিন সাহেব যে বাতি জ্বালিয়েছেন, যে মহান আকুতির সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতিদান সে কখনও দিতে পারবে না—এই নতুন-জাগা বেদনায় ছেলেটি একেবারে মুক হয়ে গেছে।

নিজের কামরায় উঠে রহমান সাহেব সতর্কতার সঙ্গে সে দৃশ্য লক্ষ্য করছিলেন। আমিন সাহেবকে ওভাবে উপেক্ষা করার জন্য তাঁর মনে কিছুটা অস্বস্তি ছিলো—বেগম সাহেবার রূঢ়তাও তাঁকে কম বিস্মিত করেনি। আমিনকে কি তিনি সত্যিই চিনতে পারেন নি?

বরাবর নিষ্ঠাবান সহপাঠির প্রতি এখন রহমান সাহেব কিছুটা করুণা বোধ করেন আর, আশ্চর্যের কথা যা, কিছুটা ঈর্ষাও। কখনই পড়াশুনায় আমিন সাহেবের সঙ্গে তিনি পেরে ওঠেননি। তবে পড়াশুনায় যা পারতেন না কূটবুদ্ধিতে তা সামলে নিতেন।

শেষোক্ত গুণের জন্যই তো দু' সহপাঠির মধ্যে আজকে আসমান-জমিন ফারাক। সারাটা জীবন শিক্ষকতায় কাটিয়ে বিয়ে না করে দাম্পত্য সুখ ও শান্তি কি তা না জেনে আমিন সাহেব এতদিনে কি মাশুল আদায় করলেন?

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়লো।

নিমগাছের তরল সবুজ পাতায় শীতের রোদ একটু একটু করে গলছে; দূরে কোথাও অদৃশ্য এক পাখী স্বরতরঙ্গের রেশমী এক জাল বুনছে; অবাধ স্বাধীনতার ক্ষিপ্র উন্মাদনায় বাজ পাখী আসমানের অঙ্গনে নিজের দর্পিত শক্তি রেখার পর রেখায় এঁকে চলেছে। অতীতের সেই বিধুমুখী বধূ কোথায় গেলো?

বেগম সাহেবা একটার পর একটা জিনিস সাজাতে তখন ব্যস্ত—

জি-ই-সি ইস্ত্রি ইস্পাতের দ্যুতিতে বাইরের ঝকমক রোদকেও হার মানিয়েছে। সেদিকেই বিশেষ করে বেগম সাহেবার প্রলুব্ধ দৃষ্টি। নিজেদের জন্যেই এটা রেখে দিলে কেমন হয়—আগেকার ইস্ত্রি ভালো কাজ দিলেও বর্ণের তেমন ঔজ্জ্বল্য নেই। বোনকে বললেই হবে অনেক চেষ্টা করেও ইস্ত্রিটা পাওয়া গেল না।

শেষ ঘণ্টা।

খালেক-শফিক সাহেবের দল পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে রহমান সাহেবকে বিদায় সম্ভাষণ জানান—কিন্তু এই প্রথমবারে মতো তাঁদের সম্মিলিত গলার স্বর রহমান সাহেবের কানে বড় ফাঁপা বড় কৃত্রিম মনে হয়। আবেগ নাই, প্রাণ নাই।

ট্রেন আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। পাঁচজন ছাত্র তাদের বিদায়ী অধ্যাপকের দিকে চেয়ে। তিনজনের চোখের কোণে সজল ঝিকিমিকি।

কত যুগ গেলো নিজেকে কেন্দ্র করে এই সজল ঝিকিমিকি রহমান সাহেব দেখেন নি। একদা যে বলতো 'তোমাকে ছেড়ে এক মিনিট থাকতে পারি না গো' তাকেও আর হাতড়ে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কোথায় কেমনভাবে যে বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গেলো। মনোরাজ্যে এখন যিনি অধিষ্ঠিতা তিনি বেগম সাহেবা—নিজের চতুর সংগ্রহের সাফল্যে দীপ্যমানা।

ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেলে রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বেগম সাহেবা হাসেন। জিনিসপত্তর মন্দ জোটানো যায় নি এই দু'দিনের সফরে। সেই বিশেষ মুহূর্তে রহমান সাহেব কিন্তু বেগম সাহেবার হাসিতে অতীতের প্রলেপ খুঁজে পান না বা বর্তমানের কোনো নিশ্চয়তা।

শাড়ী বাড়ী গাড়ী

খোদা মুনিমকে ছাপ্পর ফুড়ে দিয়েছে। সংশয়ী বন্ধুরা অবশ্য বলে, তার সব কিছুই শ্বশুরের বদৌলতে। এর পেছনে ঈর্ষা আছে। কারণ, মুনিম শ্বশুর তনয়ার প্রেমে পড়েছিলো, এখন শ্বশুরের কথা ওঠালে চলবে কি করে।

জবাবে হয়তো মুনিমের বন্ধুরা বলবে, প্রেম করার পেছনেও তার একটা হিসেব ছিলো। আরও হয়তো বলবে, প্রেম করাটা পদমর্যাদার মতো একটা ফ্যাশানের জিনিস, যার ধাপে ধাপে আছে শাড়ী আর গাড়ী। প্রথমে অবশ্য রশীদার টানা চোখটাই মুনিমের চোখে পড়েছিলো। তখন বিত্ত তার ঘরে আসেনি, প্রথম যৌবনের চমকিয়ে দেওয়া হৃদয়-সম্ভার থেকে তখন সে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়নি। তাই তখন রশীদার আয়ত চোখের স্বচ্ছ গভীরতায় সে মিষ্টি এক নীড়েরই স্বপ্ন দেখেছিলো, সোনারূপার কথা ততটা ভাবেনি।

রশীদার খেয়াল ছিলো কিন্তু অন্য রকম। দু'হাজারী বাপের আদুরে বেটি ব'লে রূপার ঝলক ও টাকার গমকের কথা ভুলবার অবকাশ সে বড় একটা পায়নি। তাই আচম্বিতে সে যখন আবিষ্কার করলো যে, তার হিসেব-না-মানা মন এক সাধারণ চাকুরিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তখন মনের কোণে তার এই খেয়ালই ছিলো, কি করে সমাজের উপর-কোঠায় মুনিমকে টেনে আনা যায়।

ইচ্ছে যখন আছে—বিশেষ করে ছ'হাজারী দুহিতার ইচ্ছে—পথও একটা বেরিয়ে যায়। তার বাপ সি, আই, ই, করিম সাহেবের আনাগোনা মোগল-পাঠানদের মহলে। তাই মুনিমের নসীবে বাদশাহী অনুগ্রহের ছিটেফোঁটা সহজেই জুটে যায়। এবং রশীদা মিসেস মুনিম হবার বেশ কিছু আগেই পুলকিত হয়ে টের পায় যে, তার ভাবী স্বামী একশো থেকে তিনশো, তিনশো থেকে সাতশো, সাতশো থেকে সাড়ে আটশোতে উঠে গিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবনের উপরের দিকের ভাঁজে ভাঁজে মিশে গিয়েছে।

মুনিমের চেহারায় আর কিছু থাক্ বা না থাক্, লোকে যাকে নধর-কান্তি বলে তা আছে। তার উপর খোশ নসীবের দ্রুত আনাগোনায় শরীরে তার চর্বি এবং মুখে চিকনাই বেশ এসে জমা হয়েছে। এর মধ্যে চাটগাঁর বরকত আলী থেকে তিনটা স্যুট বানিয়ে এবং কোলকাতা থেকে টাই আর জুতো আনিয়ে শরীরের মসৃণতার সঙ্গে বাইরেরও নিভাঁজ পারিপাট্যের সে এক সংযোগ ঘটিয়েছে। যখন সি, আই, ই, সাহেবের (পাকিস্তান হওয়ার পরেও বৃটিশ জমানার মাহাত্ম্যের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি) চোখে ঠোকর-মারা-ভাবে সাজানো ড্রইংরুম-এ মোগল-পাঠানদের জমায়েত হয়, তখন তাদের মধ্যে নধর এক ছাগ-শিশুর আবির্ভাব দেখে তাদের দিল বড় খোশ্ নয়।

অতএব যখন একদিন রোশনাই ও বাজনাইর ভেতর দিয়ে তাদের শাদী মোবারক হয়ে গেল তখন রাত্রে সাজানো উপঢৌকনের সারি দেখে বর ও বধুর মনে মিলনের সুখের চেয়ে রূপা ও সোনার জেহেজগুলিই বেশী দোলা দিলো।

অবশ্য তাই ব'লে এ বলা যায় না যে শাদীর শ্বাসরোধ-করা অনুষ্ঠানগুলির পরে মাঝরাতে রশীদার জানালার বাইরে নিম গাছের উপরে তারাখচিত নীল আসমানের ছোট এক কোণে দুষ্টু হাসির মতো আধবাড়ন্ত চাঁদ চোখে পড়েনি, বা মুনিন যখন পাতলা বেগুনী রঙের

বেনারসী শাড়ী-পরা নব পরিণীতার দিকে আড় চোখে দেখলো তখন চারবছরের পরিচিতাকে কিছুটা রহস্যময়ী বলে মনে হয়নি।

শাড়ী তো শাদীর পর পরই হ'লো। গণ্ডার পর গণ্ডা, গরীব লোকের ঘরে যেমন ছেলেমেয়ে আসে। শাড়ী পেয়ে যেমন রশীদার তৃপ্তি; শাড়ী দিয়ে তেমনি মুনিমের চিত্ত-স্ফীতি।

বাড়ী হতে কিন্তু বেশ দেরী হলো। তার একটা কারণ অবশ্য রশীদার নিজেরই মনে সংশয় ছিলো কোন্‌টা ঠিক আগে দরকারঃ গাড়ী না বাড়ী। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ের কয়েকমাস পরেই ঘরোয়া কয়েকটা বৈঠক হয়ে যায়, এবং দুই জিনিসের সুবিধার কথা তন্ন তন্ন করে বিচার করে তারা দু'জনেই শেষ পর্যন্ত একই সিদ্ধান্তে আসে যে, গাড়ীর আগে বাড়ীই যেন ভালো। সি, আই, ই, সাহেবের দৌলতে চাকুরী ও পারমিটের সমন্বয়ে বাড়ী করবার খায়েশ যখন অনেকটা পুরণ হওয়ার পথে, তখন অতর্কিত বাইরে থেকে তুচ্ছ একটা বাধা এসে মুনিমের মনকে দু' একদিনের জন্ম বেজার করে তুললো। চিঠি লিখেছে শাহেদ আলী, তার কলেজ জীবনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এককালে এমন কিছু নেই, যা তারা দু'জনে মিলে তারুণ্যের সদর্প অহমিকায় করেনি। বেকার হোষ্টেলে থাকতে দু'জনে বাজী রেখে হাড়কাটা গলিতে কোনো শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপককে আচমকা ধরবার খোশখেয়ালে সন্ধ্যের পর ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছে; মাঝে মাঝে তাদের খায়েশও যে পুরো হয় নি, একথা বোধ হয় বলা যায় না। পরে যখন দু'বন্ধুর মধ্যে আলোচনা হয়েছে, অধ্যাপক সাহেবের সঙ্গে পরের দিন দেখা হলে তিনি যদি জবাবদিহি চান তবে কি উত্তর তারা দেবে, তখন মুনিমই দর্পের সঙ্গে বলেছিলোঃ আরে রাখ, ও কি জিজ্ঞেস করতে যাবে, যখন উল্টো জিজ্ঞেস করবো তুমি চান্দু কি করছিলে, তখন বেটা কি জবাব দেবে?

অন্য একবার হয়তো ফারপো রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে পাঁচ ছয় টেবিল দূরে কোনো নীল-নয়নার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শাহেদ সমর্থ

হয়েছে। মেয়েটিও দেহের ব্যঞ্জনায় ও চোখের ভাষায় দু'বন্ধুকে যুগপৎ নাস্তানাবুদ করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি। শাহেদ ভেবেছে, মেয়েটির দাক্ষিণ্য তাকেই লক্ষ্য করে মুনিম ভেবেছে, তারই কাছে অপরিচিতা নিজের হৃদয়ের নৈবেদ্য অর্পণ করেছে। বাইরে অবশ্য মুনিম বলে: দেখরে শাহেদ, মেয়েটা তোকে গিল্‌ছে কি ভাবে। শাহেদ উল্টো: গিল্‌ছে বটে, তবে আমি-পুঁটিকে নয়।

সে সব অবশ্য অনেকদিনের কথা। পেছনে ফেলে আসা তারুণ্যের ঝলমলানো বৈভব মোগল-পাঠানের বিক্রমে, রূপা জহরতের দ্যুতিতে, নরম শাড়ীর অগাধ কোমলতায়, বাড়ী করার নিকট খুশীতে নিষ্প্রভ ও ম্লান হয়ে গিয়েছে। এবং সেজন্য সাতাশ-বসন্তে ভারাক্রান্ত মুনিমের মনে কোনো ক্ষোভ নেই।

আশ্চর্য, শাহেদ চিঠি লিখেছে টাকা চেয়ে। বলেছে বউয়ের গুরুতর অসুখ, তার নিজের এখন খুব হাত টান, বন্ধু যদি শ' পাঁচেক টাকা পাঠায় তবে বড় সুবিধা হয়। এই টাকা চাওয়ার প্রস্তাবটা মুনিমের কাছে বড় নোংরা মনে হয়, কারণ মোগল-পাঠানদের দুনিয়ায় গরীব স্বামীর বউয়ের অসুখ হওয়ার কথা কেউ ভাবে না।

বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বন্ধুর চিঠির জবাব এই বলে দেয় যে, বাড়ী করবার দরুন তাদের হাত বড়ই টানাটানি, এখন শ' পাঁচ টাকা দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে বউ ভালো হয়ে যাবার পর যদি সে এবং শাহেদ দু'এক দিনের জন্য তাদের এখানে এসে বেড়িয়ে যায় তবে তারা খুব খুশী হবে।

তবুও, তাজ্জবের কথা, মন থেকে মুনিম বন্ধু ও তার বউয়ের কথা একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। যখন ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের কাছে গিয়ে সে পুরো একটা সেগুন গাছ কি ভাবে আদায় করবে তার মতলব ভাঁজে তখন কথার ফাঁকে ফাঁকে শাহেদের বউয়ের কথা তার মনে পড়ে যায়। মেয়েটি শ্যামলী হলেও তন্বী ও হাস্যময়ী ছিলো। চোখে

লাগতো বেশ। স্পষ্ট মনে পড়ে, বিয়ে করবার পর বন্ধু যখন তার বউকে প্রথমবারের মতো দেখায়, তখন তার নিজের দিলটা বড় বিগড়ে গিয়েছিলো। মনে হয়েছিলো, এ হাস্যময়ী শ্যামলী তন্বী তরুণী যে স্নিগ্ধ শান্তির সম্ভাবনা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, তা রশীদার মধ্যে, তার চোখের স্বচ্ছ গভীরতা সত্ত্বেও, হাজার হাতড়ালেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেন এমন হয়েছিলো, তা মুনিমকে এখন কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবে না। কি কারণে বন্ধুর বউকে দেখে নিজের পরিণীতার প্রতি সাময়িকভাবে গভীর এক অসন্তোষ বোধ জেগেছিলো, তাও সে বলতে পারবে না। তবুও তখন একথাটাই মনে জেগেছিলো যে, শাহেদ তার উপর দিয়ে টেক্কা মেরেছে। কেন মেরেছে, কি ভাবে মেরেছে—মনের সে গহন-জটিল প্রশ্নগুলির জবাব সে কোনোকালেই দিতে পারতো না, এখনও পারবে না।

ফরেষ্ট অফিসারের বাংলো থেকে নিজের আস্তানায় ফিরে গিয়ে প্রথমেই দেখা হয় রশীদার সঙ্গে। অনেক দিন পরে এই প্রথম মুনিম রশীদার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে। সুখী গৃহিণীর সমস্ত চিহ্ন তার সারা শরীর জুড়ে জলজ্বল করছে; কিন্তু কোনো যেন পেলবতা নেই। সহসা এক মুহূর্তের জন্য মুনিমের মনে এই প্রশ্ন জাগে: রশীদাকে সে ঠিক কি ভাবে চেয়েছিলো? চটুল, কথাবার্তায় নিপুণা, তাস্ পিটানো খলখল করে হেসে পড়া, অশুদ্ধ ইংরেজী ঘটা করে বলা ও ঈষৎ মেদাঙ্গিনী, ধন-দর্পিতা গৃহিণী ব'লে, না-অন্য কিছু হিসাবে? তার দিকে স্বামী যে কিছুটা নূতন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তা রশীদার স্থূল চোখেও ধরা পড়লো, বললো: চেয়ে কি দেখছো?

'কিছু না'—মুনিমের স্বর কেমন যেন আড়ষ্ট শোনায়।

তবে বিকেলে যখন সহকারী পুলিস সুপারের বাসা থেকে আমন্ত্রণ এলো চায়ের, তখন নিজেকে ফিটফাট করতে মুনিম যতটা যত্ন নিলো ততটা তীক্ষ্ণ নজর রাখলো যে, স্ত্রীর শাড়ীর সঙ্গে ব্লাউজের রঙ মিশ

খেয়েছে কিনা এবং তার গলার হারের সঙ্গে নূতন স্যাণ্ডেলের চপটা মানিয়েছে কিনা।

বাড়ীটা একদিন সম্পূর্ণ হলো। এর পেছনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অজস্র মেহনত করেছে—তাই তৈরী হয়ে যাওয়া বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রশীদার মনে সাময়িক এক দ্বন্দ্বের ভাব জেগেছিলো: তোফা বেশী দেখতে কে—বাড়ী না স্বামী? আর মুনিমেরও একথা মনে হয়েছিলো: এখন তার পক্ষে কে বেশী অপরিহার্য: বাড়ী না বউ? দু'জনের আবার একই কথা মনে হয়েছিলো: ছেলে হলে গর্বের ভাবটা—সুখের কথা তো তাদের জানাই নেই—এর চেয়ে বেশী হবে কি?

মাঝে মাঝে রশীদার এখন একথা অবশ্য মনে হয় যে, একটা ছেলে কি মেয়ে হওয়া ভালো। দুই কারণে তার এ কথা মনে হয়। শাড়ী হলো, বাড়ী হলো। গাড়ী না হয়ে ছেলে হওয়াই এখন বরং ভালো। তাতে শুধু সংসারেরই পূর্ণতা আসবে না, মুনিমকেও আরও দৃঢ়তর শৃঙ্খলে বাঁধা যাবে। এর দরকার রশীদা এরই মধ্যে টের পেয়েছে। কারণ, মনে তার কোনো সূক্ষ্মতা না থাকলেও সে নারীর সহজাত অনুমান শক্তির উপর ভর করে এ কথা স্পষ্ট বুঝেছে যে, কখনও কখনও বিরল ও দুর্লভ-গভীর কোনো অবসর ক্ষণে—মুনিম তার প্রতি যেন কিছুটা অসহিষ্ণু, কিছুটা নারাজ হয়ে ওঠে। এই যে এত টাকা-ঢালা এত সাধ ও পরিশ্রমের নূতন ইমারত, তাতে এরই মধ্যে কোথায় যেন গভীর এক খাদ আশ্রয় নিয়েছে, কোথায় যেন নোনা ধরেছে।

মাস দুয়েক পরে, রশীদা যখন সন্তান-সম্ভবা এবং গাড়ীর জন্য টাকা যখন বেশ কিছু জমা হয়েছে—তখন টাউন রেশনিং অফিসার-এর বাড়ীতে চায়ের দাওয়াত খেতে গিয়ে এক কোণে শাহেদ ও তার বউকে চুপটি করে বসে থাকতে দেখে মুনিম যেমন তাজ্জব হয় তেমন হয় অপ্রস্তুত। পরে জানতে পারে, বন্ধুর মুখেই, সে এখানে সাবডেপুটি হয়ে এসেছে।

অনুযোগ ক'রে মুনিম বলে : তুমি জানো আমি এখানে আছি, তাও এখানে আসবার সময় আমায় কিছু জানালে না।

শাহেদ বেশ ভদ্রভাবেই জওয়াব দিলো : বড় তাড়াহুড়া করে এসেছি, খবর দেবার সময় পাইনি। তারপরে কথাচ্ছলে মুনিম আরও জানতে পারলো যে, শাহেদ এখনও বাসা পায়নি, তার এক প্রফেসর বন্ধুর তিন কামরাওয়ালা বাড়ীর একটা কামরা নিয়ে আপাতত আছে।

আহত হওয়ার ভান করে মুনিম বলে : কেন, আমাদের এখানে এসে উঠতে পারলে না, বন্ধুকে ভুলেই গিয়েছ নাকি?

মিষ্টি হেসে—কিন্তু সে হাসিতে কেমন যেন এক শাণিত বিদ্রূপ ছিলো, শাহেদ বলে : না ভাই, ভুলবো কেন, বন্ধু হলে কি ভোলা যায়।

কথাটা সহজ, তাও মুনিমের মনে হলো সে কথার পেছনে কোথায় বেশ একটা মোলায়েম খোঁচা আছে।

ত্বরিত দৃষ্টিতে একবার মুনিম বন্ধুর বউয়ের দিকে তাকিয়ে নিলো। সম্প্রতি তার যে কোনো গুরুতর অসুখ করেছিলো তার চেহারা দেখে এখন সে কথা বুঝা ভার। আগেকার মতো তন্বীটিই আছে, বেতসলতার মতো কম্পমান তার দেহের সুষমা মুনিমের মনে এখনও কিছুটা ঘোর ধরিয়ে দেয়। সত্যি কি ওর অসুখ করেছিলো, না ধার চাওয়ার বাহানা করে বন্ধু সে কথা লিখেছিলো।

মুনিম বন্ধুর বউয়ের দিকে ত্বরিত দৃষ্টিতে যে একবার তাকিয়ে নিলো তা রশীদা ত্বরিততর চোখে দেখতে পেয়েছিলো। মনটা হঠাৎ রশীদার কেঁপে ওঠে। এই যে বাড়ী, এই যে হরেক রংয়ের কত ধরনের শাড়ী, এই যে হবু হবু গাড়ী—এগুলিই কি সত্যিকারভাবে সে চেয়েছিলো, না এগুলি চেয়েছিলো অন্য কোনো কারণে? তার মনে কখনই ছিলো না সূক্ষ্ম কোনো অনুভূতি। সূক্ষ্মতর কোনো চাওয়ার সঙ্গে মুখোমুখি কোনো পরিচয় তার এ পর্যন্ত ঘটেনি। তবে সাড়ে তিনশো টাকা মাইনে-পাওয়া সাবডেপুটির পনেরো টাকা দামের মিলের শাড়ীপরা বউয়ের দিকে

তাকিয়ে হঠাৎ তার একথাই মনে হলো যে, জীবনের কোনো জায়গায় সে যেন বড় এক মার খেয়েছে, অথচ ঠিক বুঝতে পারছে না।

চায়ের যখন জলসা তখন সব সময় এক দম্পতির কথাই ভাবা যায় না। বাধ্য হয়ে মুনিমকে আরো অনেকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়, যদিও বন্ধুজায়াকে গভীরতরভাবে পর্যবেক্ষণ করবার ইচ্ছে তার পুরোমাত্রায় ছিলো। রশীদাকেও অন্য অনেকের সঙ্গে আলাপ করতে হয় এবং সবসময় স্বামীর দিকে নজর রাখবার চেষ্টা তার ফলবতী হয় না।

জলসা যখন খতম হয়, বন্ধুকে মুনিম বলে: আমাদের এখানে সামনের রোববারে খানা খেতে এসো। তারপর সবচেয়ে মিষ্টি হাসি হেসে—অন্ততঃ সে নিজে মনে করে সেটাই তার সবচেয়ে মিষ্টি হাসি, বন্ধুর বউকে বলে: আপনিও আসছেন তো? বন্ধুর বউও মিষ্টি হাসির জবাব দেয় মিষ্টিতর হাসি হেসে: আপনি যদি আসতে বলেন আর আপনার বন্ধু যদি নিয়ে যান আসবো। এর মধ্যে রশীদা তাদের সামনে এসে শাহেদ ও তার বউ দুজনকেই বলে, যেন তারা কত দিনের জানা আপন লোক: যে ক'দিন আপনারা বাসা না পান আমাদের এখানে এসেই থাকুন না কেন। তারপর স্বামীর দিকে মুখ তুলে চেয়ে বলে: তুমি কি বলো? স্তব্ধতার ভাব কৌশলের সঙ্গে গোপন রেখে মুনিম বলে: এতে আমি আর কি বলবো, এলে তো ভালোই হয়।

শাহেদ জিনিসটাকে মোলায়েমতার পর্যায়েই রেখে বলে: না ভাই, এখন আর যাওয়া যাবে না, আমার প্রফেসর বন্ধুটি কিছুতেই ছাড়বে না।

ঈষৎ মেদাঙ্গিনী মাতৃত্বের পূর্বাভাস-স্বাক্ষরিতা রশীদার মধ্যেও সাময়িকভাবে কেমন করে যেন একটা মসৃণতা আসে, তার স্থূল মনেও সূক্ষ্মতার এক ঝিলিক খেলে যায়। স্বামীর বন্ধুর দিকে তার আয়ত চোখের গভীরতা ছুঁড়ে মেরে বলে: ইনিও তো আপনার বন্ধু, এক বন্ধুর এখান থেকে আর এক বন্ধুর ওখানে আসা এমন কি অশোভন? তারপর শাহেদের বউয়ের

দিকে সখীর মতো হাত কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে : কি বলেন ভাই, ঠিক না ? সে শুধু মুচকি হাসে।

যাবার সময় বন্ধুকে মুনিম বলে : রোববারে তোমার জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দেব সাতটা নাগাদ। তারপর বন্ধুপত্নীর দিকে চেয়ে : আপনিও আসবেন কিন্তু। শেষের কথাগুলি রশীদার বুকে কেমন যেন বাজে।

ধার করে আনা জীপে চড়ে যখন তারা বাসায় ফিরে যাচ্ছে, রশীদা স্বামীকে বলে : তুমি যে বললে তাদের জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দেবে, গাড়ী আমাদের কই ? তার এক অভাবনীয় জবাব দেয় মুনিম : কেন গাড়ী নেই বলে মনে কি তোমার কোনো ক্ষোভ আছে ? প্রশ্নটার ধরন একটু অতর্কিত বলে চট করে রশীদা তার জওয়াব দিতে পারে না। শুধু বলে : কি কথার কি জওয়াব।

সারা পথ ধরে স্বামী-স্ত্রীতে আর কোনো কথা হয় না।

শনিবার বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে মুনিম রশীদাকে বলে : শোনো এক ভালো খবর আছে। একটা আটচল্লিশ মডেলের পুরনো অষ্টিন পাওয়া যায়, দেখবে ? তখন স্বামীর এই ব্যস্ততার পেছনে অন্য কোনো অর্থ আছে কিনা, সে কথা ভাববার মতো অবকাশ রশীদার হয়নি, তাই সহজ স্ফূর্তির সঙ্গে তখনই বললো : চলো এখনই দেখে আসি।

গাড়ীটা এক সাহেবের, দেশে ফিরে যাওয়ার সময় বিক্রী করে যেতে চায়। বললো, শুধু পনেরো হাজার মাইল চলেছে, ইঞ্জিনটা এখনো খাসা রয়েছে, পাঁচ হাজারে দিয়ে দেবে। যদি তারা চায় গাড়ীটা দু'তিনদিন পরখ করে দেখতে পারে, পছন্দ হলে এবং দরে বনলে নেবে, নতুবা কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মোটামুটি গাড়ীটা তাদের পছন্দই হলো। তিনদিন চালিয়ে দেখা
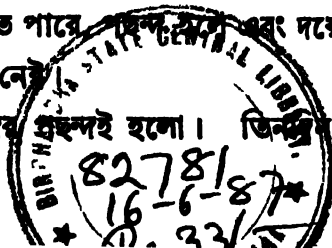
যাক কেমন কাজ দেয়, যদি বড় রকমের কোনো গোলমাল না করে তবে হাজার পাঁচেক টাকায় এ গাড়ী কেনা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না।

গাড়ী অন্ততঃ তিনদিন রাখতে পারায় মস্ত এক সুবিধা হলো : কাল সন্ধ্যায় এতে করে শাহেদ ও তার বউকে আনিয়ে নিতে পারবে। তখন শাহেদ ও তার বউ দু'জনেই দেখবে শাড়ী বাড়ী গাড়ী মিলে মুনিম ও রশীদার কি ঠাট-বহর। সেই ঠাট-বহর দেখে বন্ধুর নিভাঁজ তৃপ্তির ভাব ও তার বউয়ের শ্যামলী সুষমা অটুট থাকে কিনা সেও লক্ষ্য করবার জিনিস হবে।

রোববারের বিকেলের দিকে গাড়ীটা কিন্তু ষ্টার্ট নিল না। হাজারো চেষ্টা করেও মুনিম গাড়ীকে যখন চালু করতে পারলো না, তখন এই ভেবে হাঁপিয়ে উঠলো, কি করে বন্ধু ও বন্ধুজায়াকে আনানো যায়। তাই শরণাপন্ন হলো রশীদার। সে সল্লাহ্ দেয়, সহকারী পুলিশ সুপার খান্‌কে ফোন্ করতে। তার হাতে নাকি দু'টা জীপ আছে। একটা কিছুক্ষণের জন্য হয়তো দিতে পারবে।

খান সাহেব ফোনে বললেন, জীপ পাওয়া যাবে, ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

জীপ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও মুনিমকে তেমন যেন খুশী মনে হলো না—তার দিকে একপলক চেয়ে রশীদা অন্ততঃ তাই আঁচ করলো। বললো : কেন, জীপে বন্ধুদের আনতে কোনো অসুবিধা হবে? কিছুক্ষণ স্ত্রীকে পর্যবেক্ষণ করার পর মুনিম বলে : নিজের গাড়ী পাঠিয়ে যা সুখ পরের জীপে কি তা হয়।

এবার কিন্তু রশীদা বড় তাড়াতাড়ি জবাব দেয় : আসবে যারা তারাও যখন পর তখন জীপটা পরের হলে কিসের এমন ক্ষতি?

—পুরুষ নিজের বন্ধুকে ঠিক পর ভাবতে পারে না।

—আর বন্ধুজায়ার কথা পুরুষ কি ভাবে?

রশীদার কথায় যে ঝিলিক ছিলো তা মুনিমের মনকে কিছুক্ষণের জন্য

অবশ করে দেয়, শিগ্‌গীরই সামলিয়ে নিয়ে বলে : পর-আপনের অত সূক্ষ্ম বিচারের কথা আজ তোমার মনে হলো কেন ?

রশীদা আর সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার মনে করে না।

জীপ একাই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত মুনিম বন্ধুদের আনতে যায়। একবার রশীদাকে বলেছিলো সঙ্গে আসতে। জবাবে কিন্তু সে 'ঘরে অনেক কাজ আছে' সে-অজুহাতে আসতে রাজী হয়নি। মুনিম অবশ্য বুঝে উঠতে পারেনি কাজটা ঠিক কি। কারণ রাঁধবে তো রাঁধুনী, পরিবেশন করবে বেয়ারা, এর মধ্যে এমন কি বড় কাজ রশীদার পড়ে গেল ? মুহূর্তের জন্য এ-কথাও তার মনে হয়েছিলো, ইচ্ছে করেই রশীদা তাকে একা ছেড়ে দিলো, কিছুটা পরখ করবার এবং কিছুটা বাজিয়ে নেবার মতলবে।

অনেকদিন পর এই প্রথম মুনিম সরাসরি নিজের মনের দিকে তাকায়। তাতে অবশ্য জীপ চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হয় না। এতটুকু সে বুঝতে পারে যে, বন্ধুকে তার দরকারের সময় পাঁচশো টাকা দিয়ে সাহায্য করেনি বলে শাহেদের মনে তার প্রতি নিশ্চয় গভীর এক বিতৃষ্ণা আছে। এবং এও বোধহয় ঠিক, সে বিতৃষ্ণা শুধু শাহেদের মনেই আবদ্ধ থাকেনি, তার বধূর মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। যতই মোলায়েমভাবে শাহেদ তার কথাগুলির জবাব দিক, যতই মিষ্টি হেসে তার বউ মুনিমের দাওয়াত গ্রহণ করুক, তবুও মনে মনে তার সম্বন্ধে কি তারা ভাবে, সেটা তার বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। তাদের দাওয়াত করবার পেছনে মুনিমের আসল উদ্দেশ্য এই যে, তার প্রতি তাদের মনে কোনো খাদ আছে কিনা সেটা বের করা। চায়ের জলসায় সে সুযোগটা ঠিক হয়নি।

আর যতই এ চিন্তাটা সে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক, সে বুঝতে পারে যে, বন্ধুর প্রতি অদ্ভুত এক ঈর্ষার ভাবও তার মনে ঠাঁই পেয়েছে। তার মনে বন্ধুজায়ার [illegible] পেলবতার কতটা সম্পর্ক সে এখনও নিজের

মনে যাচাই করে দেখেনি। তবে গত ক'দিন ধরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে হামেশাই তার মনে হয়েছে যে, শাহেদ ও তার বউ তাকে এবং রশীদাকে জীবনের গভীরতম এক খেলায় হারিয়ে দিয়েছে। সে হারাটা সত্যি কি মিথ্যা, আজ সে যাচাই করে দেখতে বদ্ধপরিকর।

প্রফেসর বন্ধুর বাড়ীর যে কামরায় শাহেদ ও তার বউ থাকে সেখানে তারা মুনিকে ডেকে নিয়ে এলো। কামরাতে ঢুকেই তার নিরাভরণতাই মুনিমের চোখে প্রথম ধরা পড়ে। একটা তক্তপোষ—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বোধ হয় তাতে শোয়, তিন চারটে পুরনো বেতের চেয়ার, একটা ভাঙা বেতের টেবিল। কামরার এক কোণে ছোট একটা সস্তা দামের বিবর্ণ হয়ে যাওয়া আলনা—সেখানে পাইকারিভাবে শাড়ী তোয়ালে কামিজ মোজা ঝুলছে।

সে কামরায় আসবার আগে স্বামী-স্ত্রী বোধহয় মনের সুখে গল্প করছিলো; কেউ যাওয়ার জন্য এখনও তৈরী হয়নি। বন্ধুজায়া হঠাৎ বলে: আপনার জন্য একটু সরবৎ নিয়ে আসি? আর মুনিমকে প্রতিবাদ করবার কোনো সুযোগ না দিয়েই সে ভিতরের দিকে চলে গেল।

বন্ধুকে এই প্রথম মুনিম একা পায়। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে বলে: আমি তোমাকে দরকারের সময় পাঁচশো টাকা ধার দেইনি বলে নিশ্চয়ই মনে মনে তুমি আমাকে খুব ছোট ভাবছো।

—তা ছোট ভাববো কেন, টাকা না থাকলে টাকা দেবে কোত্থেকে? শাহেদ কথাটা যথাসম্ভব সহজ করে দিতে চায়।

—তুমি নিশ্চয়ই সে কথা বিশ্বাস করোনি, ভেবেছো, যে-বন্ধু দালান ওঠাতে পারে, সে ইচ্ছা করলে দরকারের সময় তোমাকে নিশ্চয়ই পাঁচশো টাকা ধার দিতে পারতো।

—থাক ভাই ওসব কথা, দরকার এখন তো আর নেই, সে কথা তুলে কি হবে।—শাহেদের গলার স্বরে বিদ্বেষের কোনো আভাস পাওয়া যায় না।

নেবুর সরবৎ নিজের হাতে বয়ে এনে তস্তরীর উপর গ্লাসটা মুনিমের সামনে রেখে দিয়ে সহজ মিষ্টি হেসে বন্ধুজায়া বলে : আপনাকে খাতির করবার মতো আমাদের তেমন সামর্থ্য তো নেই, যদি মনে না করেন এ সরবতটুকু খেয়ে ফেলুন।

তার কথাগুলি শুনে মুনিমের একবার মনে হয়েছিলো কিছুটা তাতে যেন ব্যঙ্গের ভাব আছে; কিন্তু খুশীতে জলজ্বল-করা বন্ধুপত্নীর শ্যামলী পেলবতা লক্ষ্য করে তার মন থেকে সে সংশয় উবে যায়। মনে হয়, খুশীর ভরাট স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করে স্বামী-স্ত্রী কেউই স্রোতস্বিনীর কোনো জায়গায় কোনো পঙ্কিল আবিলতা আছে কিনা, তার খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করে না। মুনিম বরং খুশীই হতো যদি তারা ভাবে-ব্যবহারে এ কথাটা তাকে বুঝিয়ে দিত যে, সে তাদের প্রীতি পাওয়ারও যোগ্য নয়। কিন্তু সরবৎ আনার পেছনে মনের এই যে সহজ অকুণ্ঠিত মাধুর্য তা উপলব্ধি করে বন্ধুজায়ার দিকে বোবা বেদনায় সে চেয়ে থাকে।

খুব ঘটা করে রশীদা শাহেদ ও তার বউকে গাড়ী থেকে নামিয়ে সোজাসুজি তার ড্রইংরুমে নিয়ে যায়। রশীদার সাজবার মধ্যে বেশ একটা রুচির পরিচয় আছে, সচ্ছলতার আভাস তো থাকবেই। শাহেদের বউয়ের সাজগোজ লক্ষ্য করে নিজের প্রতি রশীদা বেশ প্রীতই বোধ করে। তার তীক্ষ্ণ চোখে এড়ায় না—যে-মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ী শাহেদের বউয়ের পরনে, তা নতুন কেনা নয়; গলায় একটা সোনার হার পরেছে বটে, তবে বড় সরু; হাতে যে কয়গাছি চুড়ি আছে সেগুলিও তাই। সব মিলে তাই রশীদা বেশ খুশীই বোধ করে। সে খুশীর ভাব আরও বাড়ে যখন সে লক্ষ্য করে শাহেদ ও তার বউ দু'জনেই রশীদার মহার্ঘ আসবাবে-ভরা ড্রইংরুমের চারদিকে কৌতূহলী ও সপ্রশংসিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

খুশী হয়ে ওঠা মন অবশ্য হঠাৎ বড় দমে পড়ে, যখন সে দেখে বারবারই

ড্রইংরুমের আসবাব-পত্র থেকে স্বামী-স্ত্রীর দৃষ্টি পরস্পরের উপর নিবদ্ধ হচ্ছে; চোখে চোখে তারা অন্তরঙ্গ ধরনে কি যেন কথা বলছে। সে কথা বাইরে থেকে আঁচ করা রশীদার পক্ষে যদিও মুশকিল, এটুকু সে বুঝতে পারে যে, তাতে তার ড্রইংরুমের আসবাব-পত্রের প্রতি কিছুটা কৃপার ভাব আছে। এ কৃপার ভাবের পিছনে তারা পরস্পরে যে কত খুশী সে কথাটাও যেন নিপুণভাবে উচ্চারিত হচ্ছে।

তার অস্বস্তি গভীরতর হয় যখন মুনিমের দিকে সে আড়চোখে চেয়ে দেখে। তার চিকনাই মুখে কেমন যেন এক স্তব্ধতার ভাব এসেছে। মনে হয়, মসৃণ কোনো এক বিষাদে মন তার ছেয়ে গেছে। কি তার কারণ সেও রশীদা অনেকটা আঁচ করতে পারে যখন দেখে মুনিম অবকাশ পেলেই বন্ধুজায়ার দিকে কেমন এক বোবা আকুতিভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

স্পষ্ট সে বুঝতে পারে 'শাহেদের সঙ্গে আচম্বিতে দেখা হওয়ার পর থেকেই মুনিম মনে মনে তার বউয়ের সঙ্গে রশীদার তুলনা করা আরম্ভ করেছে এবং সে তুলনার প্রতিযোগিতায় রশীদার বারংবার হার হয়েছে। এটা কেমন করে ঘটলো সে ঠিক বুঝতে পারে না। রূপসী না হলেও কুরূপা তাকে কেউ বলবে না। কলেজ জীবনে এমনকি তার চোখের প্রশংসা তার বান্ধবীদের ভাইরা অনেকেই করেছে। একথা বান্ধবীদের মুখেই সে শুনেছে। আর মুনিমও তো তাকে দেখে শুনে যাচাই করে তার প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছে।

তারপর তাদের বাড়ী হয়েছে, বিত্তবান না হলেও বিত্তবান অনেক বন্ধু জুটেছে, সমাজের সিঁড়ির অনেক কয়টা ধাপ ডিঙ্গিয়ে তারা এখন বেশ উপরের দিকেই আছে। দু'একদিনের ভেতরই মোটামুটিভাবে ভালো একটা গাড়ীও হয়ে যাবে। তবুও কিনা এ পাঁচ বছর পরে মুনিম তার এক বন্ধুজায়ার দিকে বেদনাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ এ স্থূল সচ্ছলতা-পিয়াসীর মনের আনাচে-কানাচে গভীর এক

হতাশা ও সুস্পষ্টতর এক ব্যর্থতার অনুভূতি ঘুরতে ঘুরতে তার সমস্ত অন্তরে অসহনীয় এক জ্বালা ধরিয়ে দেয়। মনে হয়, এ হাল্কা শিফনের শাড়ী তার সারা দেহে বিছুটির মতো ছড়িয়ে আছে, কানের হাল্কা দুল এখন যেন বিশমণি বোঝা, নতুন দালানের ভাঁজে ভাঁজে ঘুন ও ফাটল ধরেছে, সখ করে যে মটরগাড়ী এনেছিলো তা বোধহয় কোনোদিন আর ষ্টার্ট নেবে না।

এমন কি তাজ্জব হয়ে রণীদা আবিষ্কার করে পেটে যে ছেলে তার দেহের সমস্ত রস ও প্রাণশক্তি চুষে নিয়ে তাদের আর্থিক সচ্ছলতার মতোই ফেঁপে ফুলে উঠছে, সেও পরে শাড়ী বাড়ী গাড়ীর মতো—আর সেগুলির চেয়েও যা বড়, তার স্বামীর মতো—তাকে অভাবনীয়, অসম্ভব এক প্রতারণা করবে। আর ধন-মান-দর্পিতা রণীদা এমনি করেই একদিন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বেয়ারা এসে বলেঃ মেমসাহেব টেবিল লাগগিয়া। তাই তো টেবিল যখন লেগে গেছে, তখন মনের সঙ্গে হিসেব নিকেশ করবার অবসর আর কই?

এতদিনের অভ্যাস ও সংস্কার মুহূর্তের বেদনা-বোধে ভুললে তো চলবে না। তাই নিপুণভাবে উঠে দাঁড়িয়ে অতি মিষ্টি ধরনে হেসে সে মেহমানদের বলেঃ চলুন এবার খানা-কামরায়; খাওয়া তৈরী।

হার জিৎ

ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মণিরুন্নেসার কামরা মুছতে গিয়ে অবিবাহিতা চাকরানী শরিফা, বয়স সতেরো আঠারো হবে, নিজের শরীরের মধ্যে অস্বস্তিকর পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। প্রথমে গলাতে সুড়সুড়ি জাগে, সঙ্গে সঙ্গে আসে খাকারির ভাব। সেটা দমন করতে গিয়ে ভেতর থেকে বমির মতো কি যেন ঠেলে আসতে চায়। ভুমুল চেষ্টা করে সেটা চেপে ন্যাকড়াটা এক পাশে রেখে (ময়লার চাকা চাকা দাগ সপ্ত-ঘটা অশুচির মত ন্যাকড়াতে গেঁথে গেছে) গভীর ক্লান্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় ; তারপর জড়োসড়ো হয়ে কর্ত্রীর দিকে অপরাধ-কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে পেছনের অঙ্গনে ছুটে গিয়ে নালায় বড় বড় চাকভিতে থুথু ফেলে। থুথু ফেলা সারা হলে, শরীরের ঝিমঝিমানি একটু কমলে কর্ত্রীর কামরায় ফিরে গিয়ে ন্যাকড়াটা আবার হাতে তুলে নেয়।

শরীফার শরীরের মাঝামাঝি সব অঙ্গ সন্ধানী চোখ মেলে দেখে মণিরুন্নেসা চাকরানীটার অবস্থা আঁচ করতে পারে। তবে তার প্রশ্নটা হয় বড় স্থূল : ছেলে হবে নাকি ? চমকে ওঠে শরিফা : ও কথা কয়েন না আম্মা, আপনার পায়ে পড়ি, ও কথা কয়েন না, আমার যে মুখ দেহানোর উপায় থাকবে না।

—মিনসেটা কে রে ?

শরিফা মাথা নামিয়ে নেয়।

—এখন তো খুব লজ্জা দেখি, তখন মনে ছিলো না ? মণিরুন্নেসার কণ্ঠে নৈতিক বিরাগ ঝংকৃত হয়ে ওঠে।

শরিফা তাও কথা বলে না।

—মিনসে তোমায় শাদী না করলে পরে পস্তাতে হবে। এখন ঘর মুছা সেরে ফেলাও।

বাইরে কড়া নাড়বার শব্দ হয়।

—তোমার আব্বা এলেন বুঝি, দরজাটা খুলে দাও।

শরিফা দরজা খুলে দেখে কর্তা। শাহেদ ভ্রূ কুঁচকিয়ে শরিফাকে একবার দেখে নেয়। তারপর জোরে জোরে পা ফেলে সারা বারান্দা জুতোর আওয়াজে ধ্বনিত করে কামরায় ঢোকে। শরিফা কেমন থমকে যায়।

স্বামীর বিরস মুখ দেখে মণিরুন্নেসা বুঝতে পারে তাস খেলায় শাহেদ আজকে খুব হেরে এসেছে। সাবধানে কথা বলতে হবে। তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে : চা আনবো।

মুখ ভেটকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে শাহেদ বলে : চা খেয়ে এসেছি। রশীদকে দিয়ে এক প্যাকেট সিগ্রেট আনিয়ে দাও।

—রশীদ জাহানারাকে নিয়ে মাঠে গেছে।

—নিসার কই ?

—ফুটবল খেলতে বেরিয়েছে।

—চাকর গেছে ছায়ের করতে। ছেলে গেছে সামাদ বনতে। এখন সিগ্রেট আনবে কে ? স্বামীর মেজাজ দেখে মণিরুন্নেসার বলতে ভরসা হয় না যে ফিরবার পথে তিনিই তো এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনে আনতে পারতেন। হয়তো সব পয়সাই তাসে গেছে এও হতে পারে। শরিফাকে ডাক দিয়ে আঁচল থেকে এক টাকার দু'টা নোট বের করে মণিরুন্নেসা বলে : যাও তো তোমার আব্বার জন্য এক প্যাকেট সিগ্রেট

নিয়ে এসো। ওই যে সবুজ বাক্সটা পড়ে আছে ওটা নিয়ে যাও, অন্য সিগ্রেট এনো না।

সামান্য এক চৌকিদারের মেয়ে হয়ে ইনকামট্যাক্স অফিসারের গিন্নী বনা কম বরাত নয়। সেটা সম্ভব হয়েছিলো শুধু মণিরুন্নেসার রূপের জোরে। এক মহকুমা শহরে 'টুর' করতে গিয়ে ডাক বাংলার পাশের খুপরীতে সতেরো বছরের মণিরুন্নেসাকে দেখে শাহেদের চোখে কিছুক্ষণের মতো পলক পড়েনি। দুধে একটু জাফরান ছেড়ে দিলে যে রং হয় সেই রং সপ্তদশীর সারা দেহে উচ্ছল ঔদার্যে ছড়িয়ে পড়ে কখনও রজনীগন্ধা কখনও গোলাপ হয়ে সৌরভের সম্ভাবনায় শাহেদের মনকে উচ্চকিত ও দেহকে কাতর করে তুলেছিলো। প্রথমে খেয়াল হয়েছিলো কিছুটা মজা করে নেয় তবে ওদিকে চৌকিদার আবার খুব হুঁশিয়ার। সাহেব যদি এক হাজার টাকা কাবিন দিয়ে মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যান তার বলবার কিছু থাকবে না। তবে আগুনে ঘি ঢেলে চলে যাবেন সেটি হবে না।

থাকবার মধ্যে ছিলো এক বুড়ী মা। ছেলের কথা শুনে একেবারে থমকে গিয়েছিলেন। তবে সে ধমকানিতে পরওয়া না করে শাহেদ এক হাজার টাকা কাবিনেই রাজী হয়ে মণিরুন্নেসাকে ঘরে এনেছিলো।

ছেলে না হওয়া পর্যন্ত কেটেছিলোও ভালো। মণিরুন্নেসার দেহের রস ও পুষ্টিকে নির্যাসের মতো নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে বের করে এনেও তা শেষ না হতে দেখে শাহেদ হয়রান হয়ে গিয়েছিলো। তবে হয়রানীতে হার মানে নি। ছেলে হওয়ার পর সপ্তাহ পাঁচেক বিরতির পর সে-নির্যাসের খেলা নতুন উদ্যমে শুরু করেছিলো। তারপর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও সমাজকে নিজের থেকে ক্রমে ক্রমে সরে যেতে দেখে পর্যায়ক্রমে তাস, মদ ও সহধর্মিনী থেকে নিত্যতিনীর আশ্রয়ে নিজেকে

ছেড়ে দিয়েছিলো। এ-চাকরীতে টাকার যখন টান নেই তখন আর কার পরওয়া।

সংসারের সব কাজ তদারক করে খাওয়া সেরে বাতি বুঁজিয়ে শাহেদের গা বাঁচিয়ে (বিশেষ এক সময় ছাড়া গায়ে গা লাগলেই শাহেদ আজকাল খাঁক করে ওঠে) বিছানায় মণিরুন্নেসা নিজের শরীর এলিয়ে দেয়।

—ঘুমুচ্ছেন নাকি, শরিফার অবস্থাটা দেখেছেন, ওকে তো এখন বিদায় দিতে হয়।

—বিদায় দিতে হবে কেন, রশীদের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেই হবে। স্ত্রীর দিকে মুখ না ঘুরিয়েই শাহেদ ব'লে।

—তাহলে রশীদের এই কাম, হারামজাদা বজ্জাতকে কালকেই বলবো শরিফাকে বিয়ে করতে, বেচারীর মুখ দেখলে কষ্ট হয়।

—তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমিই বলবো, ওদের বিয়েতে কিছু টাকা পয়সা খরচ করতে হবে।

—টাকা পয়সা খরচ করতে হবে কেন ?

—টাকা পয়সা খরচ না করলে রশীদ যদি ওকে বিয়ে করতে রাজী না হয়।

—পেট বাধিয়েছে একজনের আর রাজী হবে না। ওকে তাড়িয়ে দেবো তাহলে।

—ও-সব কথা মুখে এনো না, সব ভেস্তে যাবে, রশীদ রাজী না হলে উল্টো তোমার বিপদ।

—আমার বিপদ কেন ?

—আর নেকু সেজো না। এত চটকানি-পিটকানি খেয়েও কথাটা বুঝতে পারো না। এবার স্ত্রীর দিকে শাহেদ ফিরে তাকায়-তবে তীব্র বিরক্তির দৃষ্টিতে।

মণিরুন্নেসা তখন আর না বুঝে পারে না। চমকায়, কলিজার এক অংশ ভিতরে খসে যায়। স্তব্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে—যেন শেয়ালের খপ্পরে অসহায়া মুরগী।

পরের দিন দুপুর বেলা মণিরুন্নেসা আলমারী আর বাক্স খুলে নিজের শাড়ী ও গহনাগাটির হিসেব-নিকেশ করে। এ-ব্যাপারে শাহেদ খুব উদার। স্ত্রীর জন্য উপহার নিয়েছে, নিজেও কিনে দিয়েছে। রঙ-বেরঙের বিভিন্ন ডিজাইনের সিল্ক, জর্জেট ও জামদানী শাড়ী দেখে মণিরুন্নেসার চোখ জুড়িয়ে যায়। যেমন গহনার বহর দেখে মনে প্রগাঢ় তৃপ্তি পায়। তার রূপ দেখে শাহেদ না মজলে কেয়ামৎ পর্যন্ত মাথা খুঁড়লেও এর একটাও তার নসীবে জুটতো না। এ-সব নিয়ে পালিয়ে গেলে কেমন হয়, বাপ আদর করে রাখবেন। কিন্তু নিসার জাহানারার কি হবে? জাহানারাকে অবশ্য সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে তবে নিসার বাপকে ছেড়ে নানা বাড়ী যেতে রাজী হবে না। মাকে সে বিশেষ তোয়াক্কা করে না। করবেই বা কেন? এখন সে বড় হচ্ছে না, মাকে যে বাবা পাত্তাই দেন না নিজের চোখ দিয়ে এখন তা দেখছে না?

শাহেদ যে এর আগেও বহুবার কষ্টিনষ্টি করেছে তা মণিরুন্নেসা নিজের শরীর দেখে বুঝতে পারে। শরীরটা এখন কত ঢিলে হয়ে গেছে। স্তনটা কি ভাবে নেমে এসেছে। এর মধ্যে তিনবার গর্ভস্রাব হয়ে গেছে, অকালে মারা গেছে দু'টি সন্তান। জন্ম থেকেই জাহানারার গায়ে ঘা ছিলো, অনেক রকমের মলম দিয়েও অনেকদিন সারানো যায়নি। তারপর রক্ত পরীক্ষা করিয়ে বিস্মুথ ইন্‌জেকশান দিয়েছিলো, তাতে সেরেছে। সে সব জেনেও মণিরুন্নেসা স্বামীকে কখনও কটু কথা বলেনি। পুরুষরা ওরকম করেই থাকে। চৌকিদারের মেয়ে হয়ে অফিসার-স্বামীকে সে সব সময় নিজের আচলে বেঁধে রাখবে কি করে। কিন্তু তাই বলে ঘরের ঝি-এর সঙ্গে।......সুযোগ পেলো কি করে?

ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সে সিনেমা দেখতে গেছে কয়েকবার। সেই মওকা বোধ হয় শাহেদ ছাড়েনি। তবে ব্যাপারটা যখন ঘটেই গেছে, আর পালিয়েও জিনিসটার সুরাহা হবে না, তখন রশীদের সঙ্গে শরিফার বিয়েটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তারই চেষ্টা করতে হয় মণিরুন্‌নেসাকে।

স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে যায়ঃ শরিফাকে রাজী করাবে সে, রশীদকে বাজাবে শাহেদ। শরিফাকে রাজী করতে বেগ পেতে হয় না। শরিফার আসল অবস্থা কিছু না জেনে রশীদও রাজী হয়ে যায় যখন শাহেদ তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তাকে একটা পিওনের চাকরী জুটিয়ে দেবে।

কথামত কাজ। পিওনের চাকুরীই শুধু জুটলো না, শাহেদের কল্যাণে রশীদ নিজের জেলাতেই কিছুদিনের মধ্যে বদলী হয়ে গেলো। যাবার দিনে মণিরুন্‌নেসাকে কদমবুসি করে শরিফা, নতুন এক বেগুনী রঙের শাড়ী পরনে, শাহেদের পা ছুঁয়ে বলেঃ আসি আব্বা, দোয়া করবেন। তখন ঝট্ করে শাহেদের মুখে কোনো কথা বেরোয়নি।

নতুন রাখা মাষ্টারটা বেশ ঠাণ্ডা মানুষ। অক্লান্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে চুপচাপ পড়িয়ে যায়। নিসার হাজারো বদমাসী করলেও চাপা হাসি তার মুখে লেগেই থাকে। কাপড় ধোপার কাছে সে কখনও দেয় কি না ছাত্রের সেই বেয়াড়া প্রশ্নও হজম করে নেয়, মুখে বিরক্তি ফুটতে দেয় না। একদিন নিসার মাষ্টারের দিকে বুড়ো আঙ্গুল তুলে বলেঃ আপনি তো জিওগ্রাফীর কিছুই জানেন না, কালকে আমায় বলেছিলেন না অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী মেলবোর্ণ।

মাষ্টার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বলেঃ মেলবোর্ণ বলবো কেন?

—তবে অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী কি?

—সিডনী। মরিয়া হয়ে মাষ্টার আন্দাজে ঢিল ছোড়ে।

—কক্কা। ক্যানবেরা তা হলে কোন্ দেশের রাজধানী?

মাষ্টারের মুখ লাল হয়ে যায়।

মণিরুন্নেসা তখন মাষ্টারের সাহায্যে এগিয়ে আসে : মাষ্টার সাহেবের সঙ্গে বেয়াদপী করতে নেই নিসার। তা মাষ্টার সাহেব, আপনিও একটু মন দিয়ে পড়াবেন, ছেলে ভুল শিখলে তো মুস্কিল।

—আর ভুল কখনও হবে না, বেখেয়ালে মুখ থেকে ভুল নামটা বেরিয়ে গিয়েছিলো। কাতর চোখে মাষ্টার নিসারের মার দিকে তাকায়।

সে-চাউনি দেখে মণিরুন্নেসার বড় মায়া হয় : একবার ভুল হয়েছে তো কি হয়েছে, নিসার ভালো করে পড়া বুঝে নিও।

মার উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিসার বলে : আবার কোনো ভুল করলে আব্বাকে বলে দেব কিন্তু।

সেদিন নিজের হাতে মাষ্টারকে চা এনে দেয় মণিরুন্নেসা। তার জবাবে ভীত অথচ কৌতূহলী চোখ মেলে মাষ্টার মণিরুন্নেসাকে পর্যবেক্ষণ করে নেয়।

স্বামীর সঙ্গে এখন কোনো কিছুতেই মিল নেই। ছেলেও কাছে ঘেঁষে না। কোনো কিছু দরকার হলে বাপের কাছ থেকেই চায়। ছেলে-মেয়ের বেলায় শাহেদ দরাজ দিল। কিছু চাইলে না করে না! খুব বেশী কাতরামি করলে হঠাৎ এক সময়ে চটে গিয়ে নিসারকে নিদারুণ ঠ্যাঙ্গায়। মেয়েকে নাইয়ে খাইয়ে কাপড় পরিয়ে আদর করে সংসারের খবরদারি করেও দিন পোহাতে চায় না। তখন মাষ্টারের দিকে চোখ পড়েই।

বয়স আর কত হবে, বাইশের বেশী বোধ নয়। বি-এ পাশ করে চাকরীর খোঁজে আছে, টায়ে টায়ে পাশ করেছে বলে চাকরীর বাজারে তেমন সুবিধে করতে পরেছেনা। কিন্তু বড় শান্ত আর লাজুক। তার নিজের বয়সটা একটু কম হলে মাষ্টারকে মণিরুন্নেসা ভজাবারই চেষ্টা করতো, তার সঙ্গে পালিয়ে নতুন এক সংসার পাততো। মাষ্টারের চাকরী পেতে দেরী হলে কোনো ক্ষতি ছিলো না, তার এখন যে শাড়ী-গহনা আছে দু'জনের সংসার তাতে সহজেই অনেকদিন চলে যেতো।

আজকাল মণিরুন্নেসা মাষ্টারের সঙ্গে গল্প করাও শুরু করে দিয়েছে। তার বাড়ীর সব খবর কয়েকদিনের মধ্যেই বের করে ফেলে। সেই বড় ছেলে, তার চাকরী কবে হবে তাই এখন সংসারের সকলে ভাবে। বোন একটা সোমত্ত হয়েছে তবে সামর্থ্যের অভাবে উপযুক্ত বর জুটছে না। একটা ভাই এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে। স্কলারশীপ না পেলে বা বড় ভাই-চাকুরী না হলে তার আর কলেজে পড়া হবে না।

সে-সব বৃত্তান্ত শোনে মণিরুন্নেসার মনটা বেশ নরম হয়ে যায়। দেশের কথা নতুন করে মনে পড়ে, বাপের মুখের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার একটা বোনও তো এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। বাপ জানিয়েছেন পাশ করলে তাদের ওখানে পাঠিয়ে দেবেন, বোনের বাসায় থেকে কলেজে পড়তে পারবে। তা পারবে বটে, বড় বোনের স্বামী- নসীব ভালো হওয়ায়। সে অফিসারের গিন্নী বলে মণিরুন্নেসার বুক ঠিক সুখে না হলেও গর্বে ফুলে ওঠে। এ-সুবিধা জোটাতেও খুব বেশী ছলাকলা করতে হয় না। মাষ্টারের সামনে যখন আসে তখন কাছে নিসার না থাকলে ব্লাউজের একটা বোতাম যেন কি করে খুলে যায়; মাষ্টারের মুখে নিজের হাতে একটা মিষ্টি তুলে দেয়; সার্ট পায়জামার কাপড় কিনে তা কাগজে মুড়ে মাষ্টারকে দিয়ে বাসায় গিয়ে খুলতে বলে অবশ্য যাতে কারও নজরে না পড়ে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে। নিসার কাছে থাকলে, জাহানারা আশে পাশে ঘুরঘুর করলে বা নতুন রাঁধুনী বাসায় থাকলে মাষ্টারের দিকে সে-চোখ মেলেই চায় না। অমন কাঁচা কাজ করতে যাবে কেন? এই বারো বছরে সে কম শিখেছে!

মাষ্টার সময় বুঝে একদিন এসে হাজির হয়। শাহেদ গেছে অফিসে, দরজায় টোকা মারা শুনে নিজের কামরা থেকে আলুথালু বেশে বেরিয়ে এসে মণিরুন্নেসা দরজা খুলে দেখে: মাষ্টার।

—কি চান? মণিরুন্নেসা বুকের কাছে আঁচলটা সরিয়ে আনে।

—একটা দরকারী কাজে এসেছিলাম।

—নিসারের আব্বা তো এখন ঘরে নাই।

—কাজটা আপনাকে দিয়েও হতে পারে। বলে মাষ্টার মাটির দিকে চেয়ে নিজের ময়লা পায়জামাই বুঝি দেখতে থাকে।

দরজা পুরো খুলে দিয়ে মণিরুন্নেসা বলে : এসে বলুন, কি কথা।

মাষ্টার ভিতরে এলে মণিরুন্নেসা দরজায় খিল লাগিয়ে দেয়।

বারান্দায় চেয়ারে বসে কিছুটা দম নিয়ে মাষ্টার কাজের কথাটা বলে : কুড়িটা টাকা খুব দরকার। সামনের মাসের মাইনে থেকে কেটে নেবেন। মাষ্টারের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে মণিরুন্নেসা বুঝতে পারে এই অসময়ে আসার ওটাই একমাত্র কারণ নয়। সে-উপলব্ধিতে মন সহজে সব প্রতিরোধ হারিয়ে শরীরকে কি দুর্দমনীয় ভাবে বেপরোয়া করে তোলে।

মাষ্টারের দিকে আর না চেয়ে মণিরুন্নেসা বসবার কামরার দিকে এগুতে এগুতে বলে : তা নেন, আসুন।

প্রথমে মাষ্টার কিছু বুঝতে পারে না। যতক্ষণ না বসবার কামরার পর্দার ভেতর দিয়ে তার দিকে আরক্ত মুখে চেয়ে আঁচলটা বুক থেকে আবার সরিয়ে নিয়ে মণিরুন্নেসা হাত নাড়িয়ে ডাকে।

মাষ্টারকে বিদায় দিয়ে দরজায় আবার খিল লাগিয়ে খিলে মাথা রেখে মণিরুন্নেসা হাঁপাতে থাকে। এ সে করলো কি। এ কি স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ, না তার নারীত্বের বিলম্বিত জাগরণ ? ভালোই করেছে। চৌকিদারে মেয়ে বলে কি তার মন নেই, মান নেই। লুচ্চামি করেও যদি শাহেদ তার প্রতি কোনো আন্তরিক টান বা মমতার পরিচয় দিতো তা হলে আজকে তার মাথায় এই ভূত চাপতো না। যৌবনের ভাটার মুখে এসে এই যে মনে নতুন সাধ জাগা আরম্ভ করেছে যার তাড়নায় তার দলিত শরীর দশ বছর আগেকার সুঠাম বিন্যাস ফিরে পেতে চায় অজকে বিলিয়ে দেবার জন্য—সেই দুঃসাহসী অন্তরজ কামনা থেকে

রেহাই পাওয়া যেতো যদি শাহেদের কাছে তার প্রয়োজনীয়তা কিছুটাও অবশিষ্ট থাকতো।

সারা শরীরটা এখন কাঁপতে থাকলেও, অপরাধী কামনা মনের রসে সিক্ত হয়ে চাপা নিগূঢ় এক বেদনায় ভোল বদলাচ্ছে

তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে কামরুন্নেসা বাপের অভাব-মলিন আশ্রয় ছেড়ে দুলাভাইয়ের স্বচ্ছল বেহেস্তে আসে। তাকে দেখে সকলেই চমকে ওঠে। বোনের দিকে চেয়ে দশ বছর আগে সে কেমন ছিলো মণিরুন্নেসার আবার মনে পড়ে যায়; শাহেদ নিজের মনে নতুন এক সঙ্কল্পের সূক্ষ্ম জাল বোনে; মাষ্টারের ভীতু সলাজ চোখে কৌতূহল চাড়া দিয়ে ওঠে। কামরুন্নেসার গেঁয়ো ভাব্ যেতে বেশীদিন লাগে না। দুলাভাইয়ের সংসার তাকে শরীর ও মনের দিক থেকে সযত্নে সাজানো আরম্ভ করে দেয়। আপা যদি তাঁতের শাড়ী কেনেন তো দুলাভাই কবসম সিল্কের ব্লাউজ দেন। সিনেমায় গিয়ে সুন্দরী নায়িকারা কে কি ভাবে চায়, কেমন গমকে হাটে, শরীরের পুষ্টি না লুকিয়ে কি কি ছাঁদে ব্লাউজ পরে কামরুন্নেসা দ্রুত রপ্ত করতে থাকে। তারপর কলেজে গিয়ে ছেলে প্রফেসরদের মাথা এক সঙ্গে ঘুরিয়ে বাসায় ফিরে এসে দুলাভাইয়ের দিকে শ্যালিকার চেয়েও উন্নততর ভঙ্গিমায় চায়, আর মাষ্টারের দিকে চোখ পড়লে একেবারে ব্রীড়ানতা কিশোরীর মতো নুয়ে পড়ে।

মণিরুন্নেসা সতর্ক হয়ে যায়। শাহেদ এখন তাস খেলা বেশ কিছু কমিয়ে দিয়েছে। স্ত্রী আর শ্যালিকার সঙ্গে খুব ঘুরছে। ধানমণ্ডি, রমনার লেক, কখনও নারায়ণগঞ্জ। চলো আজকে এই ছবি, কালকে ওই ছবি, পরশুদিন পিকনিক। স্ত্রীর জন্য শাড়ী বা টয়লেট-এর কোনো জিনিস আনলে শ্যালিকাও বাদ যায় না।

শাহেদের মতলব কি তা বুঝতে আর বাকী নেই। তবে মণিরুন্নেসা ওটা হতে দিচ্ছে না, বোনকে কিছুতেই কাছছাড়া করবে না। হঠাৎ

যখন মনে হয়ে যায় তার নিজের স্খলনের কথা তখন ভিতরে ভিতরে বড় নিস্তেজ বোধ করে। মাঝে মাঝে শাহেদ আজকাল, কামরুন্নেসাকে ভজাবার মতলবেই বোধ হয়, তাকে 'মণি' বলে ডাকে—যে নামে বিয়ের প্রথম কয়েক মাস ডাকতো। কামের তাড়নায় না আদর করে সেটা সে কোনো দিন বুঝতে পারে নি। শাহেদের মণিই যদি সে-হোত, বা তার একটা ছোট টুকরোও, তাহলে কি আজকে তার কোনো আফশোস থাকতো বা জ্বালার অবিরাম দাহনে মন অন্য কোনো আশ্রয় খুঁজতো। মণিরুন্নেসা যা মনে করে শাহেদ ঠিক তা নয়। রূপ ছাড়া স্ত্রীর কাছ থেকে সে আর কি কিছুই পায়নি। প্রথম যৌবনে দেহের স্বাদে মাদকতা থাকে বটে, দেহের চছটায় জাগে ঘোর তবে মনের দিক থেকে এত দুস্তর ব্যবধান ছিলো যে সে মাদকতা বা ঘোর বেশীদিন টেকে নি। ভুল অবশ্য তার নিজেরই। চৌকিদারের মেয়েকে বিয়ে করে নিজের মনের কোনো প্রতিধ্বনি তার মধ্যে কখনও পায়নি বলে এখন জীবনের কাছে অভিযোগ করে লাভ নেই। তালাক অবশ্য দিতে পারতো, তবে অনেকটা গড়িমসি করে সেটা দেওয়া হয়ে ওঠে নি। আর দুটো সন্তান বেঁচে থাকায় মা হিসেবে মণিরুন্নেসার প্রয়োজনীয়তা সে পরে মেনে নিয়েছিলো। এখন আবার বিয়ে করে জীবনের চাকা বারো বছর ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

তাই বলে পাথেয় হিসেবে এখন যা পাওয়া যায় তা সে কুড়িয়ে নেবে না এমন বেকুবও সে নয়। চৌকিদারের মেয়ে বিয়ে করেছে বলে মরবার সময়ও বুড়ী মা তাকে ডাকা দরকার মনে করে নি; তাস খেলার বন্ধুরা পর্যন্ত সেই একই কারণে তার এখানে খুব ঠেকায় না পড়লে আসে না বিশেষ করে তাদের বউদের প্ররোচনায়। তবে একদিকে সমাজ যেমন তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে অন্যদিকে টাকা বাড়ালে ঠিক ততটা আবার এগিয়ে আসছে—তুতু ডাকে বাধ্য কুকুর যেমন সাড়া দেয়। তাতে শেষ পর্যন্ত তার লাভ হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে সেটা তলিয়ে দেখবার মতো

ধৈর্য্য এখন শাহেদের নেই। আমাকে ঝাঁটা মারলে আমি উল্টো লাথি মারবো।

কার ছড়ুম করে পড়বার শব্দ হয়। কামরা থেকে সবেগে বেরিয়ে এসে শাহেদ দেখে খেলা করতে করতে জাহানারা বারান্দা থেকে অঙ্গনের পাকা সানে পড়ে গিয়ে কাৎরাচ্ছে। তার মাথার একটা দিক অসমান এক ইটের কোণায় লেগে কেটে গেছে। নিজের সার্টের কোণা দিয়ে সে-রক্ত মুছে মেয়েকে শাহেদ কোলে তুলে নেয়। ততক্ষণে মণিরুন্-নেসা ও তার বোনও ছুটে এসেছে।

স্ত্রীর দিকে তীব্র অভিযোগের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শাহেদ, কামরুন্-নেসাও সে-দৃষ্টির দাহন থেকে রেহাই পায় না।

মেয়ের কপালের যেখানে রক্ত জমেছে সেখানে অবিরত চুমো দিতে দিতে শাহেদ বলে: কেঁদো না মা, চলো একটু ওষুধ লাগিয়ে দি, এখুনি সেরে যাবে। তার পর মাথা একটু নামিয়ে তখনি আবার তুলে মেয়েকে কাতুকুতু দেওয়ার ধরনে বলে: তুকু তুকু। বাপের ওই বিশেষ ভঙ্গীতে মেয়ে প্রত্যেকবারই হেসে লুটোপুটি খায়। তবে এবার, ব্যথাটা তখনও না কমায়, ফিক করে একটু হেসে আবার বিলাপ জুড়ে দেয়।

মণিরুন্নেসা নিশ্চল হয়ে সব দেখছিলো। মনে তার অদ্ভুত এক চিন্তা জাগে: নিসার জাহানারা এ-রকম হাল্কা দুর্ঘটনায় আরো পড়ে না কেন। কামরুন্নেসা কিন্তু চটে থাকে, জাহানারা আছাড় খেয়েছে বলে তার দিকে দুলাভাইয়ের অমন করে চাওয়ার কি হলো।

শাহেদের এক সহকর্মীর বউ মারা যাওয়ায় একদিন মণিরুন্নেসা সেখানে গিয়ে আটকা পড়ে যায়। কামরুন্নেসা বোনের সঙ্গে যেতে রাজী হয় নি। মরা দেখতে তার একেবারে ভালো লাগে না। ঘরে মাষ্টার ছিলো, তাকে চুপি চুপি বলে গিয়েছিলো সে না ফেরা পর্যন্ত মাষ্টার যেন থাকে। বাড়ীতে বোনকে অরক্ষিতা রেখে যাওয়া নিরাপদ নয়, শাহেদ কোন্ ফাঁকে কি করে বসে।

তবে আঘাতটা আসে অন্যদিক থেকে। কয়েদিন ধরে কামরুন্নেসা ও মাষ্টারের মধ্যে গুনগুনানি বেড়ে গেছে। বোনকে সতর্ক করে দিতে গেলে সে খুব নিরপরাধ ধরনে বলে, মাষ্টারের কাছ থেকে সেও কিছু পড়া বুঝে নিচ্ছে।

কিন্তু সেদিন পড়ার কথা হচ্ছিলো না। পাঠ শেষ করে নিসার খেলতে গেছে, শাহেদ তাশের আড্ডায়। কসবায় কামরার কামরুন্নেসা ও মাষ্টারের মধ্যে ফিসফিসানি বেশ জমেছে।

—সামনের মাসেই চাকরীটা হয়ে যাবে। মাষ্টার বলে।

—তখন যেন ভুলো না।

—আমি ভুলবো তোমার কথা, রাত্রে আজকাল ঘুমোতে পারি না।

—যত সব মন-ভোলানো কথা।

—ছুরি দিয়ে বুক কেটে যদি তোমায় দেখাতে পারতাম। তোমাকে ডাকলে যেন আবার পিছিয়ে পড়ো না।

—আমি তো এক পা তুলেই আছি, দুলাভাইয়ের মতিগতি ভালো মনে হয় না। কোন্‌দিন কি করে বসেন।

পাশের কামরা থেকে মণিরুন্নেসা সব শুনছিলো। দেবে নাকি মাষ্টারকে দূর করে। হারামজাদা, নচ্ছার। এমনি কেমন মাওমের মতো সব সময় চেয়ে থাকে যেন দুনিয়ার কিছু বোঝে না। একেই সে নিজের দেহ বিলিয়ে দিয়েছিলো যা জীবনে আর কখনও করে নি। এরই কাছে তার দলিত, মর্দিত মন নতুন অস্তিত্বের দরখাস্ত পেশ করিতে চেয়েছিলো। আর কামরুন্নেসাও কি সহজে মাষ্টারের মাওম লাজুক ভাবে মজে গেছে। ছল করে দুলাভাইকেও টেনে এনেছে।

না, বোনের দোষ দিয়ে লাভ কি। সে যদি এখন ভালোবাসার জগতে জেগে উঠতে চায়, মনে যদি তার রওনক এসে থাকে তবে তাতে পাপের তো কিছু নেই। দুলাভাই সম্বন্ধেও তার মনে সন্দেহ জাগা বিচিত্র নয়। মাষ্টারই বা কামরুন্নেসাকে ছেড়ে তার বিগত যৌবন

বোনের দিকে ঝুঁকবে কেন। মাষ্টারের মনেও তো নতুন সাধ, নতুন স্বপ্ন জাগতে পারে। সে নিজে যেচে মণিরুন্‌নেসার বিধ্বস্ত শরীর চেয়েছে কখনও? মণিরুন্‌নেসাই বরং উল্টো তাকে কলুষিত করেছে।

নিজের-মনের ইচ্ছায় বোন যদি মাষ্টারে সঙ্গে যেতে চায় যাক। সে বাধা দিতে যাবে কেন? তার বাধা দেবার কি অধিকারই বা আছে?

তবুও এক তপ্ত শ্বাস বেরিয়ে আসে, বুককে দীর্ণ করে।

ব্যাপারটা যখন ঘটলো তখন মণিরুন্‌নেসা সম্বিত হারায়নি। শাহেদই ক্ষেপে উঠলো: হারামি মাষ্টারকে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বো না, শালা ভেবেছে পালিয়ে রেহাই পাবে, আজকেই থানায় খবর দিচ্ছি।

মণিরুন্‌নেসা প্রথমেই সেই কঠিন কথা বলতে চায় না। শাহেদ চেষ্টা না করলে কামরুন্‌নেসার ভালো বিয়ে দেয়া তার বাপের পক্ষে সম্ভব হবে না। শাহেদ আন্তরিকভাবে সে-চেষ্টা করতে যাবে তা মণিরুন্‌নেসার বিশ্বাস হয় না। আর রূপের সামনে এত প্রলোভন যে কখন কি ঘটে যায় আন্দাজ করা মুস্কিল। মাষ্টারকে তো সুবোধই মনে হয়—তাকে ও-ভাবে প্রলুব্ধ না করলে তার মধ্যে কোনো ময়লা থাকতো না—বোনকে নিশ্চয় সে মাথায় করে রাখবে। এই সম্ভাবনাকে শাহেদ ভেস্তে দিতে চায়, তাতে মণিরুন্‌নেসার মনে কঠিন প্রতিরোধ জেগে ওঠে। হোক না সে পাহারাদারের মেয়ে, এ-ব্যাপারে সে হার মানবে না। দরকার হলে নিজেই শেষ অস্ত্র মমতাহীন সুনিশ্চয়তায় ছুড়ে মারবে, পরে যা হবার হোক। তাই মণিরুন্‌নেসা স্বামীকে বোঝায়: স্বেচ্ছায় গেছে, পুলিশে খবর দিলে হবে কি?

—ফুসলাবার জন্য জেল হবে আর হবে কি, ওসব কি ভাবে করতে হয় আমার জানা আছে, অন্ততঃ কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়বো।

বাপ-মায়ের ঝগড়া দেখে মেয়েটা কেঁদে ওঠে। এবার মা তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো দেয়, মেয়েকে ঠাণ্ডা করে গলা নামিয়ে স্থির

প্রত্যয়ের স্বরে বলে ঃ ওসব করতে যেয়েন না, তাহলে আপনার মুখেই চুনকালি পড়বে।

—আমার মুখে চুনকালি পড়তে যাবে কেন? এবার শাহেদের তাজ্জব হওয়ার পালা।

—পুলিশে যদি খবর দেন তা হলে মামলার সময় আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

—তুমি আবার কি সাক্ষী দেবে? শাহেদ নিজের মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়ায়।

মেয়েটা আবার কেঁদে ওঠে। তাকে আবার আদর করে ফুসলিয়ে শেষে রান্নাঘরে চাকরের কোলে দিয়ে ফিরে আসে। ততক্ষণে মণিরুন্নেসা মন ঠিক করে ফেলেছে। কথাটা যখন শেষ পর্যন্ত বলে তখন গলাটা তার একটুও কাঁপে না ঃ সকলের সামনে তখন আমায় মুখ ফুটে বলতে হবে যে মাষ্টারকে একদিন আমি নিজের কামরায় ডেকেছিলাম।

মুহূর্তের জন্য শাহেদ একবারে স্থবির হয়ে যায়। আবিষ্কারের প্রচণ্ডতা একটু কমলে একবার ইচ্ছে হয় বউকে লাথি মেরে ফেলে দিতে। সে-ইচ্ছে সামলিয়ে নিয়ে স্ত্রীর দিকে কিছুটা বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা অন্তরঙ্গ অভিনিবেশের সঙ্গে ভাবে। ভাবতে ভাবতে তার মুখে তেরছা হাসি ফুটে ওঠে। আজকে এই বারো বছর পরে, মাকে ছেলের কাছ থেকে সরিয়ে, চৌকিদারের মেয়ে তার উপর টেক্কা মারতে চায়। অজ্ঞ, মুর্খ মেয়ে।

সেই তেরছা হাসির অগ্নিচ্ছটায় স্ত্রীকে জালিয়ে খাক করে দিয়ে দুঃসহ সান্ত্বনার স্বরে শাহেদ বলে ঃ তুমি মন খারাপ করো না মণি, তোমার বোনকে তাড়া যেতে দিই নি।

খোরোশত

যেদিন মহাশূন্যে নাকাশিয়া পাট্‌নিক নিক্ষেপ করলো আর সেই আধ মণ ভারী গোলাকার মসৃণ লোহার পিণ্ডটি আসমানের দিকে দেড়শো মাইল ধাবিত হয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে লাগলো সেদিন সারা দুনিয়া সহর্ষ বিস্ময়ে উচ্চকিত হয়ে উঠলো। বিজ্ঞানের এই নবতম সাফল্য পরিমিত ধ্বংস-চিহ্নিত মানব অস্তিত্বকে বিশাল, দিগন্তপ্রসারী সম্ভাবনায় ভরে দিলো। মানুষের দৃপ্ত সাফল্যের পুলকিত উন্মাদনা কুমারিকার অধিবাসীদেরও চঞ্চল করে তুললো, তবে কুমারিকার শাসক-বর্গ উন্মাদনা পরিহার করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

প্রান্তর ও সমুদ্রের প্রচণ্ড ব্যবধান সত্বেও নাকাশিয়া ও কুমারিকা পরস্পরের রেষে হিংসায় ও ভয়ে সর্বদা সচকিত। গত কুড়ি বছরে নাকাশিয়ার দ্রুত অগ্রগতিতে কুমারিকা এখন ঈর্ষায় অবিরত জ্বলছে; নাকাশিয়া পাট্‌নিক শুধু মহাশূন্যে নিক্ষেপ করে নি, কুমারিকার অন্তঃস্থলের দিকেও তার লক্ষ্য। ডাক পড়লো কুমারিকার বৈজ্ঞানিকদের। মাসখানেকের মধ্যেই পাট্‌নিকের অনুরূপ যন্ত্র তাঁদের উদ্ভাবন করতে হবে। যেমন করেই হোক, যত টাকাই লাগুক। নইলে দুনিয়ার চোখে নাকাশিয়ার চেয়ে কুমারিকা খাটো হয়ে যাবে।

এক মাসের যায়গায় তিন মাসে কুমারিকা 'ঘুটনিক' ছাড়লো। মাপে পাট্‌নিকের চেয়ে খাটো। ঘুটনিক ও পাট্‌নিক বেশ সদ্ভাব রেখেই মহাশূন্যে চক্কর খেতে লাগলো। তবে সীমাবদ্ধ ভূ-স্থলে নাকাশিয়া ও কুমারিকার খেচাখেচি তাতে কমলো না।

মহাশূন্য অভিযানে যখন নাকাশিয়া পরিষ্কারভাবে এগিয়ে গেলো, এমনকি প্রথমে চাঁদে রকেট নিক্ষেপ করে পরে তার আবৃত অংশের রহস্য উদ্ঘাটন করলো, তখন কুমারিকার ধৈর্য টলে ভেঙে পড়লো। নিশ্চয় নাকাশিয়ার কোনো গর্হিত মতলব আছে। মহাশূন্য থেকে ধ্বংসের কলক ছুঁড়ে মেরে কুমারিকাকে তচনচ করে দেবে। তাই হাইড্রোজেন ছেড়ে নাইট্রোজেন বোমার গবেষণায় কুমারিকার বৈজ্ঞানিকরা নিজেদের সম্মিলিত মেধা ও উদ্যম নিয়োগ করলো।

আজকে দক্ষিণ আমেরিকা, কালকে আফ্রিকা, পরের দিন সুদূর প্রাচ্যে শান্তি বিপন্ন হয়। কুমারিকার প্রধানমন্ত্রী গোল্ডউইন দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, নাকাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বেয়ারহাগ ঘোলাটে পানিতে যদি মাছ ধরার অভ্যাস না ছাড়েন তবে তাঁর সঙ্গে কোনো সমঝোতায়ই আসা সম্ভব নয়। বেয়ারহাগ হুঙ্কার ছাড়েন বণিক-সভ্যতার ধ্বজাধারীরা যদি কোনো দেশে স্বাধীনতার অনিবার্য অগ্রগতি রুদ্ধ করার প্রয়াস পান তবে নাকাশিয়া সে-দেশকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে ইতস্ততঃ করবে না।

হেমলিন নিয়ে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এতদিন হেমলিন তার আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলো। ছোট হলেও ভারী সুন্দর দেশ হেমলিন। তার ভুবন বিখ্যাত ভালসিমার হ্রদের স্থির গভীর নীল-সবুজ জলে যেমন শান্তির আভাস, তেমন তার বরফ-ঢাকা গিরি শীর্ষে, হলদে ফুল ও লালচে পাখীতে আর দীর্ঘাঙ্গী পাইনের কলঃস্বনে দাহন-হরণ প্রলেপ। তবে হেমলিন নাকাশিয়ার প্রভাব-পীড়িত দেশগুলি দিয়ে বেষ্টিত। যে-কোনো মুহূর্তে সুকানিয়া, নাকাশিয়ার বিশ্বস্ত সহচর, হেমলিনের সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। তা করতে গেলে, গোল্ডউইন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, নাকাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। বেয়ারহাগ উল্টো শাসান, সুকানিয়া যদি আক্রান্ত হয় তবে আক্রান্তকারী যেন নাকাশিয়ার রকেটের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে।

ছুনিয়ার সমস্ত রাজধানী উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। যদি আকাশের পূর্ব-পশ্চিম কোণে এই দুই বজ্র-গর্ভ মেঘ-ঝটিকার তাড়নায় পরস্পরের দিকে সংযমহীন ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে যায় তবে পৃথিবীর প্রান্তর থেকে প্রান্তরে প্রজ্বলিত বিদ্যুতের আগুন জ্বলে উঠবে। মিসমার, চুরমার, বিধ্বস্ত হয়ে যাবে সমস্ত সৃষ্টি। মানুষের চিন্তা ও কল্পনা হাজারো হাজারো বছর ধরে বিলুপ্তিকে রোধ করবার জন্য যে অবিরাম প্রয়াস করে এসেছে ধর্মে কবিতায় ও দর্শনে ধ্বংসের বহ্নি এক লহমায় সেগুলি লকলক করে গিলে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

নাকাশিয়ার রাজধানীর কাছাকাছি এক শহর। সেখানে দু'কামরার ফ্ল্যাটে সস্ত্রীক থাকে কৃতী ইঞ্জিনিয়ার খোরোশভ। দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ, সুদর্শন যুবক। স্ত্রী নাতালি, আসন্ন মাতৃত্বের পুষ্টিতে তার কমনীয়তা ঢাকা পড়েছে, স্থানীয় এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষকতার উচ্চতম ডিগ্রী পাওয়ার জন্য অবসর সময়ে স্বামীর সাহচর্যের প্রলোভন জয় করে পাঠ্য-বইয়ের ভেতর নিজকে ডুবিয়ে রাখে।

সেদিন রাত দশটার পরে নাতালি বড় ক্লান্ত বোধ করে। মাথায় ঝিম ধরে গেছে, মনে শিক্ষা-নীতির তথ্যগুলি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মাথাটা এদিক ওদিক নাড়িয়ে, মাথার উপরে দুই হাত তুলে আড়িমুড়ি খেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে স্বামীর দিকে চায়। খোরোশভ তখনও মহাশূন্য-যানের মডেলের নির্মান-পরিকল্পনা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে আর পাশের টেবিলে রাখা কাগজগুলি নাড়াচড়া করে গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে কি যেন ভাবছে।

যে চিন্তা নাতালি মনে ঠাঁই দিতে চায় না সঞ্চিত বিভীষিকা নিয়ে সেটা আবার ফিরে আসে। নিজের অবসাদ ভুলে স্বামীর দিকে সবেগে এগিয়ে গিয়ে আবেগ-উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে: যেভাবে সবসময় তুমি ওই মডেলের দিকে চেয়ে থাকো মনে হয় ওটাই তোমার বউ। কোনোদিন যে আমার সর্বনাশ ডেকে আনবে এই বিদঘুটে পিণ্ডটি। এতগুলো

থাকতে তোমাকেই মহাশূন্যে যেতে হবে কেন, আমার কথা ভেবেও তো না করতে পারো।

স্ত্রীর দিকে গভীর মমতার দৃষ্টিতে চায় খোরোশভ। নাতালির জড়িয়ে আসা চোখে আঙুল বুলিয়ে স্থির প্রত্যয়ের স্বরে বলে: দেশের ডাকে যদি না বলি তবে ভীরুতার অপবাদ চিরকাল আমার বইতে হবে। সেটা কি দেশপ্রেমিকা হয়ে তুমি সইতে পারবে নাতালি।

স্বামীর প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে থরথরিয়ে কেঁপে নাতালি বলে: তোমার যদি কিছু হয়!

আমার কিছুই হবে না। দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবনা এই স্পেস-শীপ। এই পরিকল্পনার কোনো অংশ বিফল যেতে পারে না। তুমি মিছিমিছি ভাবছো নাতালি।

—এখন তো আমি শুধু নিজের জন্যই ভাবি না। নাতালি স্বামীর শরীরের সঙ্গে গাঢ়ভাবে মিশে যায়। খোরোশভের মনে মহাশূন্য ও পৃথিবীর মধ্যে গভীর দ্বন্দ্ব লেগে যায়। সেই দ্বন্দ্বের তাড়নায় স্বল্পভাষী খোরোশভ বাগ্মীতায় প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে: আমাদের সন্তান বড় হয়ে জানতে পারবে যে মহাশূন্য অভিযানের প্রথম সুযোগ তার বাবার নসীবেই ঘটেছিলো তখন ভেবে দেখো কত উঁচু মাথা নিয়ে সে সমাজ ও দেশের সামনে দাঁড়াতে পারবে। আর আমি যদি ছুনিয়াতে ফিরে নাও আসতে পারি, লক্ষী নাতালি তুমি অতো অধীর হোয়ো না, তবুও বিজ্ঞা-নের সাধনায় জীবনদানের চেয়ে মহত্তর মৃত্যু আর কি হতে পারে। আমাদের জাতির জনকের কথা মনে করো। তাঁর মহান নেতৃত্বে আমা-দের দেশ প্রগতির পথে কত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তিনি নিজে আমাকে এই কাজের ভার দিয়েছেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এ-কাজ আমি সাফল্যের সঙ্গে করে আসতে পারবো। তখন আমাদের এই বিশাল সুন্দর মাতৃভূমির মর্যাদা কত বেড়ে যাবে, তোমার স্বামীর নাম অন্যের সাধনায় সারা ছুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।

নতুন নির্ভরতায় স্বামীর দিকে নিজের উজ্জ্বল চোখ তুলে ধরে নাতালি বলে : আমায় প্রতিশ্রুতি দাও তুমি নির্বিঘ্নে ফিরে আসবে।

—প্রতিশ্রুতি নিয়ে কি হবে, বোকা মেয়ে, আমার হৃদয়ে হাত দিয়ে দেখো।

নাতালি আর প্রতিবাদ জানায় না। কাজ বা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মন এখনও তার আৎকে ওঠে বটে তবে নাতালি সেটা দমন করে ফেলে। স্বামী যখন তার সম্বন্ধে অবিচলিত তখন এই গুরুত্বপূর্ণ অপেক্ষার সময় খোরোশভের মনে সংশয় বা দ্বিধা জাগানো বিরাট অবিবেচনার পরিচয় হবে। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা স্বামীর মুখ নাতালি চোখ ভরে দেখে। খোরোশভের মুখের প্রতিটি ভাঁজ, ঈষৎ কোকড়ানো চুলের প্রস্থ ও রঙ, নাকের ঋজুতা, চিবুকের ভাঁজ, ওষ্ঠের আকৃতি সব-কিছুর অবিকল প্রতিচ্ছবি নাতালি নিজের মনে গেঁথে নেয়। তারপর স্বামীর আসন্ন দুঃসাহসী গ্রহাতীত অভিযানের কথা ভেবে ঝর ঝর করে কাঁদে, তবে বুকের ভেতরটা থেৎলে গেলেও সেখান থেকে কোনো শব্দ বেরুতে দেয় না। পাছে স্বামীর ঘুম ভাঙে।

মহাশূন্য অভিযানের জন্য খোরোশভকে নির্বাচিত করা হয়েছে তা প্রতিবেশীরা কেউ জানে না। নাতালিকেও বলা হয়েছে নির্বাচনের বেশ কয়েকদিন পরে। এ ব্যাপারে জাতির জনক বেয়ারহাগ ও পার্টি নির্দেশ খোরোশভ পুরোপুরি মেনে চলেছে। কথাটা বেশী জানাজানি হলে শত্রুচরের কানে গিয়ে নাকাশিয়ার সীমানার বাইরে ছড়িয়ে যেতে পারে। যদি কোনো কারণে মহাশূন্যে মানুষের এই প্রথম অভিযান সফল না হয় হয় তবে কুম্যারিকার ধন-দম্ভিত, ক্ষয়িষ্ণু সমাজ তা নিয়ে খোলাখুলিভাবে হাজারো টিটকারী দেবে। সেটা প্রগতি-গর্বিত নাকাশিয়ার পক্ষে দুঃসহ এক পরাজয় হবে।

মহাশূন্য অভিযানের প্রস্তুতি এখন চলেছে পুরোদমে। মহাশূন্যের উপযোগী সাজে সজ্জিত হয়ে স্পেস-শীপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতিদিন

খোরোশভ নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। শরীর তার তাপ কত সইতে পারে, চলাচলহীন হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকলে তার নাড়ীর গতি ও রক্ত-চাপে কোনো বিশেষ তফাৎ হয় কিনা ; ওজনহীনতায় তার শরীরের কি প্রতিক্রিয়া হয়, আকস্মিক প্রচণ্ডগতি তার স্নায়ুগুলি কি ভাবে গ্রহণ করে বারবার হরেক রকম যোরফের করে তা পরীক্ষা করা হয়।

শেষ পরীক্ষায় উৎরিয়ে যায় খোরোশভ।

স্পেস-শীপের তত্বাবধানে যিনি ছিলেন খোরোশভের দেহের প্রতি-রোধ শক্তি ও সামঞ্জস্য-বিধান দক্ষতায় সম্পূর্ণ তুষ্ট হয়ে অভিযানের প্রথম নায়ককে তিনি চব্বিশ ঘন্টা ছুটি মঞ্জুর করলেন। তখন খোরোশভ বুঝলো আসল ডাক আসতে আর দেরী নেই।

পরদিন বিকেলে স্কুলের কাজ সেরে নাতালি ফিরে এলে খোরোশভ বলে : আজকে আর তুমি পরীক্ষার পড়া পড়তে পারবে না, চলো বেরুই ; যে দিকে খুশী ঘুরে বেড়াই।

আনন্দে চমকে উঠলেও মডেলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে পরিহাস লঘু কণ্ঠে নাতালি বলে : কেন আমার সতীনকে আজ তোমার পছন্দ হলো না। আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরুলে সে যে আবার চটবে।

—চটুক, তার চটাকে থোড়াই আমি পরওয়া করি, প্রথম প্রেমের কথা কি কোনো পুরুষ ভুলতে পারে।

—ওঃ, তাহলে ওটারও ভালোবাসায় তুমি পড়ে গেছো।

নাতালির কথার ধরনে খোরোশভ বুঝতে পারে না স্ত্রীর আক্ষেপটা কৃত্রিম না গভীর ; তাই ঠাট্টার ভাব বজায় রাখাই সে নিরাপদ মনে করে : ও ছেমড়ী আর বেশীদিন আমার ঘরে থাকবে না, ততদিন একটু ধৈর্য্য ধরো।

—না ধরে আর উপায় কি, থাক ওসব কথা এখন। সামোভারে চা চড়িয়ে দি। তারপর যেখানে তোমার খুশী নিয়ে চলো।

—আজকে একটু সাজগোজ করো নাতালি, ঐ বেগুনি ফ্রকটা তোমার মানায় চমৎকার।

নাতালি রান্নাঘরে গেল খোরোশভ ভাবে ভাগ্যিস এই চব্বিশ ঘণ্টা ছুটির কথা সে বউকে বলে নি। তাহলে যা চালাক মেয়ে ব্যাপারটা তখনই আঁচ করে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিতো। অথচ তার নিজের মনে একটুও দ্বিধা নেই। ভেতর থেকে কে যেন তাকে যেন বারবার আশ্বাস দিচ্ছে নিরাপদে সে আবার মাটির বুকে ফিরে আসবে।

চা খাওয়া শেষ হলে সামান্য একটু প্রসাধন করে সেই বেগুনি রঙ-এর ফ্রক পরে নাতালি যখন আবার ফিরে আসে তখন খোরোশভ মনের খুশীতে বউ-এর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে।

—হাস্‌ছো যে বড়, খুব কদাকার দেখাচ্ছে বুঝি।

নাতালির হাতে নিজের হাত গলিয়ে খোরোশভ বলে : তুমি এক সুন্দর স্বপ্নের মতো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছো, তাই দেখ-ছিলাম আর বোকার মতো হাসছিলাম।

—আমি বুঝি শুধু স্বপ্ন ? নাতালি মধুরভাবে স্বামীকে শাসায়।

—দেখি পরখ করে, স্বপ্ন না সত্যি। বলে নাতালির হাতের অনাবৃত এক জায়গায় খোরোশভ চিমটি কেটে প্রবলভাবে হেসে ওঠে।

—দেখেছো কি স্বার্থপর। স্বপ্ন না সত্যি নিজের গায়ে চিমটি কেটে পরখ করা যায় না বুঝি। বলে হঠাৎ স্বামীর গলা ধরে ঝুলে পড়ে নিজের হৃদয়ে সমস্ত মথিত আবেগ দিয়ে নাতালি খোরোশভকে চুম্বনের বরিষণে একাধারে উদ্‌ভ্রান্ত ও সঞ্জীবিত করে তোলে।

তটে উচ্ছলতা এনে ক্ষুরধারা তটিনী বিপুউ উন্মাদনায় কোনো পূর্ণতর আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে চলেছে। এখানে শহরের সীমাবদ্ধতা শেষ ; প্রসারিত প্রান্তরের বৈভবের শুরু। কোমল নরম ঈষদুষ্ণ তৃণের শ্যামলতা ও সজীবতা নিজেদের শরীরে টেনে নিয়ে, খরকাকলিতে-মুখর তটিনীরা

বেগের ব্যগ্রতা পরস্পরের ধমনীতে অনুভব করে খোরোশভ ও নাতালি পাশাপাশি নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকে। দেখো আকাশ, মাটির গন্ধ নিশ্বাসের মতো শুঁকতে থাকো, পল্লবিনী লতার ছন্দিত বিস্তার চেতনার গহন কন্দরে সযত্নে আগলে রাখো।

লেবু গাছে পাখী ডেকে ওঠে। মাটি থেকে উঠে বসে চারদিকে চঞ্চল চোখে চেয়ে পাখীটাকে আবিষ্কার করে ছোট মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে নাতালি বলে: ওঠো ওঠো! দেখো কি সুন্দর পাখী, বলো তো ওর পাখনায় কত রঙ।

খোরোশভ না উঠেই রঙ গোনা আরম্ভ করে দেয়: হলুদ, জাফরানী, কালো।

—পারলে না, কালোতে এক লালচে ছোপ আছে দেখছো না?

তা আর দেখবার অবকাশ হয় না। গাঢ় এক শীষ দিয়ে পড়ন্ত বেলার ঝিমানো আলোক চকিতে বর্ণ-বিদ্ধ করে পাখীটা আসমানের অঙ্গনে হারিয়ে যায়।

—খুব তো আমাকে ফাঁকি দিয়ে ফুরুৎ করে উড়ে গেলে। রাখো, আমিও আসমানে যাচ্ছি। তখন দেখবো কত উপরে উড়তে পারো।

স্বামীর কথায় হাসতে গিয়ে নাতালি হঠাৎ থমকে যায়।

কিন্তু যেদিন খোরোশভ-এর ডাক আসে সেদিন নাতালি কোনো বিচলতা দেখায় না। স্কুলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলো এমন সময় অধীর তাড়ায় টেলিফোনটা বিরামহীনভাবে বাজতে থাকে। সেই ধরে, হ্যালো।

—খোরোশভ আছে?

—আছে, কি নাম বলবো।

—বেয়ারহাগ তার সঙ্গে কথা বলবেন, জরুরী কাজ।

ততক্ষণে খোরোশভ নিজে টেলিফোনের কাছে এসে গেছে, নাতালির হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে বলে: হ্যাঁ আমি খোরোশভ। আচ্ছা ধরে রাখছি। আমার শ্রদ্ধা জানবেন কমরেড। হ্যাঁ আমি প্রস্তুত।

স্ত্রীকে বলেছি. প্রথমে একটু আপত্তি করেছিলো। এখন বুঝতে পেরেছে এটা কত বড় সম্মান। ধন্যবাদ। আমাদের জাতীয় ত্রাণকর্তা ও পার্টির গৌরবের জন্য আমি সব কিছু সব সময় নিঃসংশয়ে করতে রাজী। আমাকে এই মহান দায়িত্ব দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করলেন কমরেড।

কথা সেরে খোরোশভ খুশীতে টগবগিয়ে নাতালিকে বলে: বেয়ার-হাগ নিজে খবরটা দিলেন। কত বড় সম্মান।

—তা তো হলো, দিনটা কবে?

—ঠিক দিন এখনও জানি না, তবে কালকে ভোর দশটায় আমায় রওয়ানা হতে হবে।

—কোথায়?

—তাও জানি না।

—তোমার সঙ্গে আমিও যাবো। স্কুল থেকে কয়েকদিন ছুটি নিলেই হবে।

—সেটা তো হয়না নাতালি; আমার সঙ্গে তোমায় যেতে দেবে না। আর দিলেও তোমাকে আমি বারণ করতাম। তুমি সেখানে গেলে শেষ পর্যন্ত আমার মনের জোর হয়তো ভেঙ্গে পড়বে। তাহলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে নাতালি।

—কার সর্বনাশ হবে? নাতালির গলার স্বরটা এবার একটু চড়ে ওঠে।

—দেশকে এত বড় এক গৌরব থেকে বঞ্চিত করতে তোমার মন সায় দেয় নাতালি?

—বুঝেছি। তোমার সঙ্গে যাওয়ার কথা আর বলবো না।

স্ত্রীর চাপা রাগ ও হতাশা লক্ষ্য করে তার গালে চুম্বনের চেয়েও সান্ত্বনাদায়ক টোকা মেরে খোরোশভ বলে: এ কয় ঘন্টা আর মুখ ভার করে থেকো না লক্ষ্মীটি। আকাশে উড়বার সময় তোমার মুখের যে ছবি আমি দেখতে চাই সেটা আমায় দেখাও।

বেঁকে হুমড়ে যায় নাতালি: আমি যে তোমাকে নিজের আত্মার চেয়েও বেশী ভালোবাসি খোরোশভ। আসমানে উঠলে বলো সে কথা তুমি ভুলবে না।

আমার জীবনে কখনও নয়।

কাসপিয়ান সমুদ্রের এক জায়গা। স্পেস-স্যুট পরে স্পেস-ক্যাপস্যুলে ঢুকবার নির্দেশের অপেক্ষা করছে খোরোশভ। কিছুক্ষণ আগে টেলি-ফোনে নাতালির সঙ্গে কথা বলেছে। আসন্ন মহাশূন্য অভিযানের সম্মুখীন হয়ে প্রবল উত্তেজনায় নাতালির মুখটাও এখন পরিষ্কারভাবে মনে পড়ছে না।

চোখের সামনে বৃত্তাকারের উজ্জ্বল ক্যাপস্যুলটি রকেট প্রোথিত হয়ে রোদে ঝকমকাচ্ছে আর চারিদিকে নিজের কিরণ বিকীরণ করছে।

—ফোনে আপনার ডাক পড়েছে। একজন কর্মচারী ছুটে এসে খোরোশভকে খবর দেয়।

বুকের ভিতর রক্তের কি দ্রুত খেলা। নাতালি নাকি? না নাতালি হবে কি করে। এখানকার ফোন নম্বর নাতালিকে সে জানায় নি, নিজেই জানে না বলে। তবুও কৌতুহল প্রশমিত হয় না, টেলিফোন-কিঅকস্ এর দিকে ছুটে যায়।

—হ্যালো, কে? শিরস্ত্রাণটা আলগা করে খোরোশভ রিসিভার তুলে নেয়।

—আমি বেয়ারহাগ, কেমন অনুভব করছো কমরেড?

—ক্যাপস্যুলে উঠবার জন্য অধীর আগ্রহে নির্দেশের অপেক্ষা করছি, আমার কোনো অস্বস্তি লাগছে না।

পার্টির বিশ্বস্ত সদস্যের উপযুক্ত কথা। দুনিয়াতে ফিরে এলে আবার দেখা হবে। আসমানটা চোখ মেলে দেখে এসো, কেমন?

মহৎ লোক, স্পেস-ক্যাপস্যুলের দিকে ফিরে যেতে যেতে খোরোশভ ভাবে।

ক্যাপস্থলে উঠবার নির্দেশ পাওয়া যায়। মন থেকে আর সব চিন্তা খোরোশভ সরিয়ে ফেলে। এখন শুধু সে আর মহাকাশ—মাঝখানে আর কিছু নেই। স্থির প্রত্যয়ে চালিত হয়ে খোরোশভ এগিয়ে যায়।

প্রৌঢ় এক কর্মচারী হাত নাড়িয়ে খোরোশভকে বিদায় দেন: তোমাকে এখন ঠিক মার্সের অধিবাসীর মতো লাগছে। যাত্রা তোমার শুভ হোক।

এক···দুই···তিন···চার···পাঁচ···ছয়···সাত।

স্পেস-ক্যাপস্থলের ভিতরে সীটের সঙ্গে খোরোশভের বেল্ট-দিয়ে-বাঁধা শরীরে সহসা গতির প্রচণ্ড বেগ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর দোলানি নেই কাঁপুনি নেই—সব-কিছু স্থির। কয়েক মিনিট পরে শরীরটা কেমন যেন হালকা হয়ে যেতে থাকে। হাত পা শরীর থেকে আলগা হয়ে গিয়ে শূন্যতায় ভারহীনভাবে ভাসছে মনে হয়। দেহের ভার থেকে মুক্তি পেয়ে চেতনা অনেক বেশী তীক্ষ্ণ, সজাগ হয়ে উঠেছে। এক সেকেণ্ডের জন্য দেহের স্পর্শ-বোধ ফিরে আসে। বাইরে থেকে কি একটা দাহ্য পদার্থ এসে সমস্ত শরীরটাকে যেন পুড়িয়ে দিতে চায়। পরমুহূর্তেই সে দাহনের ভাব আর থাকে না, দেহের সর্বাঙ্গ আবার ভারহীন কোমলতায় ভরে যায়।

পুরু, স্ফটিক আবরণে ঢাকা পোর্ট হোল দিয়ে খোরোশভ এক ঝলক বাইরের দিকে চেয়ে নেয়। আকাশটা কি নিকষ কালো। ওমা, একি! চোখের সামনে কি অবিশ্বাস্য বর্ণের বিজুরী। লাল, নীল, সবুজ, বাদামী, বেগুনী, হলদে, খয়েরী, গোলাপী, রঙের পর রঙ উজ্জ্বল গাঢ়তায় ও আদিগন্ত প্রসারে আসমানকে কি বিচিত্র বিবিধ দ্যুতিমান রঙ্গ-সম্ভারে ভরে দিয়েছে। পলক পড়তে না পড়তেই রঙের সমন্বয় বদলাচ্ছে, শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তের মহার্ঘতম আনন্দের মতো ঝলসাচ্ছে। শুধু বর্ণের রেখা-বিন্যাসে কি দুঃসহ সৌন্দর্য।

তারপর আকস্মিক দিনের আলো মিলিয়ে যায়। সোনালী আকৃতির

মতো আসমানের সকল অঙ্গনে তারারা সব ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তমীর চাঁদ মহারাণীর মহিমায় বিচরণ করে নিজের দেহের রূপোর তাপ দিয়ে সারা আসমানে আলোর আগুন ধরিয়ে দেয়। নীচে নীল বিস্তারটা কি, অতলান্তিক না প্রশান্ত মহাসাগর? কোনো মহাদেশের তটরেখা ক্ষীণ শ্যামলতায় সিক্ত হয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জোনাকীর মতো জ্বলছে কোন্ শহর, নিউইয়র্ক না রিওড জেনেরিও? কি করছে ওই শহরের লোক।

তাদেরকে যদি এই মহাশূন্য থেকে শুভেচ্ছার সম্ভাষণ জানানো যেতো। এই মহাশূন্যের ব্যাপ্তিতে এসে বর্ণ ও বিস্তৃতির এই প্রসারিত পরিবেশে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের প্রতি, থাক না তাদের মধ্যে কুমারিকার নাগরিকরাও, মন কি নিখাদ প্রীতিতে ভরে যায়। কলহ, দ্বেষ, ঈর্ষা সব কিছু এক নিমেষে মনের করুণ বিকলতা ও ভ্রান্তি বলে মনে হয়। কি মহান ভবিষ্যত মানুষের সামনে পড়ে রয়েছে। গ্রহ ও গ্রহান্তরে কত উচ্চকিত বিস্ময়, বিকাশ ও ব্যাপ্তির অফুরন্ত সম্ভাবনা।

নাতালি এখন কি করছে। নিশ্চয় স্কুলের টি-ভির সামনে বসে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে নিয়মিত ব্যবধানে যে রেডিও সঙ্কেত যাচ্ছে তার বিবরণ কম্পিত আগ্রহ নিয়ে শুনছে। মিছিমিছি নাতালি তার জন্য ভাবছে। মিছিমিছি কি? যদি এই যন্ত্রের কোনো অংশ বিকল হয়ে যায়। যদি পৃথিবীতে নামবার সময় কোনো অজাগতিক রশ্মির দাহনে সমস্ত ক্যাপস্যুলটা শূন্যে খসে খসে পড়ে? তাহলে।

না না, তা হতেই পারে না। কতদিন ধরে কতভাবে কত বৈজ্ঞানিক এই ক্যাপস্যুলের প্রতিটি যন্ত্রের প্রতিটি স্ক্রু পরীক্ষা করে দেখেছেন, এর নির্ভরতা সম্বন্ধে একেবারে নিঃশঙ্ক না হলে তাঁরা কি একজন জলজ্যান্ত মানুষের জীবন নিয়ে এভাবে জুয়ো খেলতেন। অন্ততঃ বেয়ারাহাম সে-রকম কোনো পরিকল্পনায় সম্মতি দিতেন না। তবু মাঝে মাঝে পৃথিবীর জন্য আনচান করে ওঠে। কোন্ সময় মাটিতে পা দেবে,

প্রান্তরের শ্যামল-সুধা আকণ্ঠ পান করবে, উষ্ণ ধরিত্রীর অন্তরঙ্গ ঘ্রাণ বুক ভরে নেবে। নাতালির চুলে আঙুল বুলিয়ে সহাস্যে তাকে বলবে: দেখেছো আমি হারিয়ে যাই নি, কোনো অপ্সরী আমায় হরণ করে নি।

নলোভস্কির কথা মনে পড়ে যায়। মাতৃভূমিকে বন্দনা করে কত সুন্দর কবিতা লিখে গেছেন, তবে পার্টির অনুশাসন সব সময় মেনে চলেন নি। শেষ জীবনে তাই তাঁকে বিচ্ছিন্নতার দুঃখ সইতে হয়েছিলো। কবি হিসেবে তাঁর যতটা মর্যাদা প্রাপ্য ছিলো সিকি অংশও তিনি পান নি। তাঁর নিজেরও অবশ্য দোষ ছিলো। যে পার্টির কর্মীরা নাকাশিয়াকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে উন্নতির ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চলছে তাদের কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে নলোভস্কি পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁর কবিতায় সংশয়ের কাঁটাগুলি অনেকের উদ্যমকেই নিস্তেজ করে দিতে পারে। তবুও তাঁর প্রতি অতটা অবহেলা অমন নির্মম উপেক্ষা পার্টি না দেখালেও পারতো। মারা গিয়ে নলোভস্কি কি নভোাঙ্গনের এই প্রশান্ত ঔদার্যের বা উজ্জ্বল কোনো জ্যোতির্ময় গ্রহের সঙ্গে স্থায়ী কোনো মিতালি পাতিয়েছেন? পার্টির বিধানঘেরা অস্তিত্ব এই অগণিত গ্রহ-বেষ্টিত মহাবিশ্বে বড় বেদনাদায়কভাবে সীমাবদ্ধ মনে হয়।

চাঁদ ও তারার মিছিল পেছনে পড়ে রইলো। সামনে সূর্যের দীপ্ত সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য। এতক্ষণে শূন্যে-ভাসমান হাত পা এক এক করে আবার শরীরে জোড়া লেগে যাচ্ছে; চাপের বাড়তিতে বুঝা যাচ্ছে মাধ্যাকর্ষণের বেষ্টনীর মধ্যে মহাশূন্য-যান নেমে এসেছে; ভূমধ্যসাগর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নাতালি, নাতালি এবার তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করো।

আঃ, কি সুন্দর আমার মাতৃভূমি। বাতাসে খেত খামারের ঘ্রাণ পাখীর কাকলি; পোঁকা মাকড়ের ডাক; মানুষের মুখ,—সেসব মিলে কি প্রগাঢ়, নিশ্ছিদ্র তৃপ্তি। মা আমার, তোমার স্নেহচ্ছায়ে ফিরে এসেছি আবার।

নাকাশিয়ার রাজধানীর বিমান-বন্দরে নেমে অধীর পদক্ষেপে খোরোশভ নাতালির দিকে এগিয়ে যায়। আলিঙ্গন আর চুম্বন শেষ হতে চায় না। বেয়ারহাগও অপেক্ষা করছিলেন। নাতালির আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হলে খোরোশভকে তিনি অভিনন্দন জানানঃ সাবাস কমরেড, দেশ ও পার্টি তোমাকে নিয়ে গর্বিত।

পরের দিন খোরোশভ যে অভ্যর্থনা পায় কোনো বিজয়ী সম্রাট বা সেনাপতিও বোধ হয় কখনও তা পাননি। লাখে লাখে লোক তার নামের বন্দনা করে। যুবতীরা হেসে চায়, তরুণীরা ফুলের মালা নিয়ে আসে।

বিরাট এক গির্জার পাশে রাজধানীর সব চেয়ে বড় স্কোয়ারের পুব দিকে এক স্মৃতি-সৌধে খোরোশভের অভ্যর্থনার জন্য মঞ্চ সাজানো হয়েছে। গির্জার চূড়ায় মহাশূন্যযানের এক রূপোর মডেল ঔজ্জ্বল্যে প্রথম প্রহরের সূর্যকেও হার মানিয়েছে। আকাশ থেকে হেলিকপ্টার স্কোয়ারে সম্মিলিত জনতার উপর খোরোশভের প্রতিকৃতি ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্যারেড আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোলাহলমুখর জনতা নিশ্চুপ। মঞ্চে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে বেয়ারহাগ ও খোরোশভ সশস্ত্র বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। প্যারেড শেষ হলে জনতার তুমুল করতালিতে অভিনন্দিত হয়ে বেয়ারহাগ তাঁর ভাষণ দেওয়া আরম্ভ করেন।

"কমরেডস। যে মহাশূন্যযানে নাকাশিয়ার বীর সৈনিক খোরোশভ মহাশূন্য প্রদক্ষিণ করে এলেন তাতে কোনো আণবিক বা ধ্বংসের অস্ত্র ছিলো না। বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করাই এই যুগান্তকারী অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিলো। শীগগীরই আমরা চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারবো। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায়ই শুধু এই ধরনের অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্ভব। তবুও আজকে আমি ঘোষণা করছি বিপরীতমুখী সমাজ-ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করবার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। যে মহামূল্যবান বৈজ্ঞানিক

তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি তা কুমারিকা ও তাঁর অনুগত দেশগুলোর সঙ্গে আমি ভাগ করতে রাজী।

তবে হেমলিনের ব্যাপারে আমি কুমারিকাকে সাবধান করে দিতে চাই। সুকানিয়া হেমলিনের সঙ্গে তার সীমান্ত যদি বন্ধ করে দেয় আর কুমারিকা তা জোর করে খুলবার চেষ্টা করে তবে সসেজের মতো তাদের দিকে আমরা রকেট ছুড়ে মারবো, সুকানিয়ার স্বাধীনতাকে বিপন্ন হতে দেবো না।"

কুমারিকা সম্বন্ধে বেয়ারহাগের মন্তব্যে খোরোশভ এই প্রথম পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারে না। বেয়ারহাগের বক্তৃতা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ জনতার উপরও নিবদ্ধ হচ্ছিলো। বিভিন্ন রঙের ফ্রক ও শার্ট সূর্যের বাড়ন্ত রশ্মিতে স্নাত হয়ে বর্ণের এক বাহার সৃষ্টি করেছে। হঠাৎ খোরোশভের মন আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। মনে পড়ে দিগন্ত থেকে প্রজ্জ্বলিত বর্ণের গ্রহাতীত গাঢ়তা। চোখের সামনে সুদূর আমেরিকার এক শহর জোনাকির মতো জ্বলতে থাকে। নলোভস্কির ভাগ্য-বিধান সম্বন্ধে আবার সন্দেহ জাগে। বেয়ারহাগের আস্ফালনে পঙ্গুতার সম্ভাবনা দেখে। এমন কি নাত্তালিকেও, আনন্দ ও গর্বে সে মহাশূন্যযানের মডেলের মতো ঝলমল করলেও, বিনাশ-শংকিত মনে হয়। আরে এ সব সে ভাবছে কি? পার্টির বিশ্বস্ত সদস্য হিসেবে এ-রকম নেতিবাচক চিন্তা করার কোনো অধিকার তার নেই। এ-কারণেই তো নলোভস্কি দেশের লোকদের আস্থা হারিয়েছিলো।

আর এক পশলা করতালিতে বেয়ারহাগের বক্তৃতা শেষ হলে খোরোশভ মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। "পার্টি ও আমাদের মহান নেতা আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা সফলভাবে সম্পন্ন করবার জন্য আমি উভয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।"

বেয়ারহাগ আবার খোরোশভকে জড়িয়ে ধরেন; নাত্তালি হাসিমুখে তাদের দিকে ছুটে আসে; জনতার হর্ষধ্বনিতে গাছে বসা পাখীরা শঙ্কিত হয়ে আসমানে নিরাপত্তা খোঁজে।

তারপর জনতার সঙ্গে সাফল্যের খুশী ভাগ করার পালা।

রাত্রের অভ্যর্থনাটা আরও জাঁদরেল হয়। রাজধানীর এক ঐতিহাসিক হর্ম্য যুগসঞ্চিত আসবাবপত্র ও তৈলচিত্রের মহিমায় ভাস্বর হয়ে অগুণতি অতিথির কলরোলে মুখর হয়ে ওঠে। আলোর ছটা শ্যাণ্ডেলিয়ারের প্রতিটি ঝুলন্ত কাঁচে রঙের ঝকমকানি ছড়িয়ে দেয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজদূতদের বেরারহাগ খোরোশভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কুমারিকার রাজদূত প্রশান্ত অনুমোদনের হাসি হেসে নিজের ভাষায় খোরোশভকে মোবারকবাদ জানান ও বেরারহাগকে কি যেন বলেন। দোভাষী অনুবাদ করে সে কথা বেরারহাগকে শোনাবার আগে খোরোশভ সেখান থেকে সরে যায়।

খোরোশভের কাছে ফিরে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বেরারহাগ তাকে এক নিভৃত কোণে নিয়ে গিয়ে বলেন: তোমাকে ভদ্রলোক জ্ঞান ও শান্তির দূত উপাধি দিয়েছেন। আর আমার কাছে আশা প্রকাশ করেছেন যে হেমলিন নিয়ে আমাদের মধ্যে মতান্তর বৈঠকের টেবিলে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

—তাই হলে ভালো হয়, কমরেড। খোরোশভ নিজেকে বলতে শোনে।

বেরারহাগের মুখে বিস্ময়ের ভাব দ্রুত রাগে পরিণত হয়। আরক্ত গণ্ডে মুখের প্রতিটি রেখা ইস্পাতের মতো ধারালো করে, ছোট জ্বল-জ্বলে চোখে সাপের ক্রুরতা এনে, হাত ছুঁড়ে মাথা নাড়িতে উষ্মার কবিতার মতো বেরারহাগ কথাগুলি উচ্চারণ করেন: তুমি না পার্টির এক বিশ্বস্ত সদস্য, পার্টির নীতির বিরুদ্ধে তুমি কথা বলতে সাহস পাও কি করে? তোমার স্ত্রীর দ্বিধার কথা শুনেই আমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিলো। জানো এই দুর্বলতা ও বিশ্বাসহীনতার কি পরিণাম।

কি করে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো খোরোশভ টের পায়নি। তবে সে আর ভয় পায় না। মহাশূন্য তার চেতনা থেকে ভয়ের শূন্যতা

কেড়ে নিয়েছে, সমগ্র মানব অস্তিত্বকে নতুন অর্থে ভরে দিয়েছে। ধ্বংসের বীজ ছড়িয়ে নাকাশিয়া হয়তো এখন কুমারিকাকে উজাড় করে দিতে পারে। কিন্তু তাতে নাকাশিয়ার নাগরিক হিসেবে খোরোশভ এখন আর কোনো সান্ত্বনা পাবে না। থাক না ছোট দেশ হেমলিন আলাদা—তাতে নাকাশিয়া কি আর দুর্বল হয়ে যাবে। শুধু হেমলিনের উপর হামলা করতে গিয়ে মানব অস্তিত্বকে বিপন্ন করা গুরুতর মূর্খোমী। আমার ব্যক্তিগত পরিণাম নিয়ে আমি আর আতঙ্কিত হবো কেন। আমার এই প্রাণদায়িনী মাতৃভূমিকে আমি কারুর চেয়ে কম ভালো-বাসি না। এর একটা ধূলিকণাও কেউ যদি কেড়ে নিতে চায় আমি জান দিতে রাজী। তাতে দুনিয়া যদি ছারখার হয়ে যায় যাক। কিন্তু যে দেশের আলাদা অস্তিত্ব আমরা এতদিন মেনে নিয়েছি তাকে এখন বিচ্ছিন্ন করবার খেয়াল আমাদের এতো পেয়ে বসলো কেন, তা নিয়ে আমরা কেন যুদ্ধের হুমকী দি।

—জানি, যদি এটাকে বিশ্বাসহীনতা মনে করেন কমরেড।

বেয়ারহাগ কিছুক্ষণ একেবারে চুপ করে থাকেন। আর এক দফা কঠিন ধমকের জন্য খোরোশভ প্রস্তুত হয়। তবে খোরোশভ সম্মোহিত হয়ে দেখে বেয়ারহাগের গণ্ড থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে, মুখের রেখা ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে, চোখে কৌতুকের ঝিলিক ফিরে আসছে। শাস্তি দেওয়ার পরে অবাধ্য ছেলের দিকে পিতা যেমন পুনর্জাগ্রত স্নেহের দৃষ্টিতে তাকান, বেয়ারহাগের মুখে-চোখে সেই ভাব ফুটে ওঠে: তুমি ছোকরা বুঝি মনে করো আমি এক দানব। যুদ্ধ বাধাবার অছিলা খুঁজে বেড়াচ্ছি। মানুষের প্রতি আমার কোনো মমতা নেই। ভয় পেয়ো না খোরোশভ, তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। অতিথিরা আমাদের নাটক দেখে হয়তো অবাক হয়ে গেছে, চলো তাদের মধ্যে ফিরে যাই। আজকে তুমি নাকাশিয়ার। শুধু নাকাশিয়ার তুমি নয়, তুমি সমস্ত মানুষের ভবিষ্যত।

মালাকাল মওত্ ও আম্মাজান

কাড়াটা কেটে গেলেও শরীরে তাকৎ এখনও পুরোপুরি ফিরে আসে নি। দিন দুই আগে মনে হয়েছিলো যে এবার বোধ হয় আর রেহাই পাওয়া যাবে না, মওত-এর সমনকে আর বোধ হয় ফেরানো যাবে না। রক্ত-চাপের পুরনো ব্যাধিটা তখন খুব প্রবল হয়ে উঠেছিলো। মনে হয়েছিলো, একসঙ্গে সারা দুনিয়াতে জল-জলা হচ্ছে—সমস্ত সৃষ্টি বোধ হয় তাতে মিসমার হয়ে যাবে।

তখন তাকে চারপাশ ঘিরে যারা বসেছিলো, তাদের চেহারার বিভিন্ন ধাঁচ অনেকটা ঝাপসা হয়ে উঠেছিলো আম্মাজানের চোখে। কাউকে ঠিক চেনা যাচ্ছিলো না। চেনবার জন্য কোনো ব্যাকুলতা থাকলেও চোখে তেমন স্বচ্ছতা ছিলো না।

এখনও ছেলেমেয়ে, চুলহীন বিবি ও ছেলেমেয়ের বুড়ো বাপ তাঁকে ঘিরে বসে আছে, হাল্কা ধরনের কথা বলে ও খোশগল্প করে তার দিল বাহলাবার চেষ্টা করছে। এমন কি, 'তার' পেয়ে চাটগাঁ থেকে তাঁর মেজ ছেলেও ছুটে এসেছে কলকাতায়—পাকিস্তান হওয়ার পর যার কলকাতা আসা হলো এই দ্বিতীয়বার। বড় মেয়ে, রাহেলা, অবশ্য আসেনি। সে আসবে এ আশাও আম্মাজান করেন নি।

এবার প্রায় মওতের দরজা থেকে আম্মাজান ফিরে এসেছেন—নিবিড় ধরনের যে ঘোর তাঁকে ধরেছিলো, তার মধ্যে এক পলক মওত এর সঙ্গে মুখোমুখিও বোধ হয় আম্মাজান হয়েছিলেন। মনে হয়েছিলো, ধোঁয়াটে শূন্যতার মতো মওত-এর চেহারা।

বেঁচে উঠেই বা কি লাভ হলো। এখন চারপাশে নিকটজনকে চোখে ভালো লাগছে নিশ্চয়, তবে দু একদিন পরেই প্রাত্যহিক জীবনের দৈন্য ও গ্লানির সঙ্গে যখন আবার তিনি মুখোমুখি হবেন, তখন বোধ হয় এই খুশীর ভাব আর অটুট থাকবে না।

বয়স তাঁর এখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। মুখে ভাঁজ পড়েছে অগুণতি, আর মুখের চামড়ায় সাদা কালো কি সব দাগ। দাঁত চার-পাঁচটা এখনো আছে—যদিও নড়বড়ে। দাঁত মাজবার সময় মাড়ি দিয়ে কালচে রঙের রক্ত বেরোয়। বড় ছেলের 'ফরহ্যান্স' টুথ পেষ্ট দিয়ে মাঝে মাঝে সংস্কার করবার চেষ্টা করে দেখেছেন তাতে মাড়ির জ্বালা আরও বাড়ে।

পরণে তাঁর প্রায় সবসময় থাকে কমদামী আধময়লা এক শাড়ী। সখ করে মাঝে মাঝে চটি কিনেছেন, কিন্তু সেটা পরেছে তাঁর ছোট ছেলেই বেশী। শীতের মওসুমেও খালি পায়ে তাঁকে ঘরের চারদিকে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে।

শুধু যখন অসুখে পড়েন, সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট ও দুশ্চিন্তা থেকে তিনি কিছুটা রেহাই পান। তবে সে রেহাই পাওয়া নিরর্থক হয়, তাঁর বিছানায় পড়ে থাকবার সময় সংসারের ঝামেলা কে পোহাবে সে কথা ভেবে।

মণ্ডপ-এর ঠাণ্ডা পরিবেশ থেকে সংসারের উষ্ণ পরিধিতে ফিরে আসবার পর আম্মাজান মনে গভীর প্রশান্তি অনুভব করেন। এমন গাঢ় নিবিড় তৃপ্তির ভাব তাঁর ভাবনা-পীড়িত জীবনে এই বুঝি প্রথম। মনের এই অবস্থায় তাঁর সাধ যায় তাঁর বিগত জীবনের এক খতিয়ান করে দেখতে।

প্রথমে তাই তাঁর নজর পড়ে শাড়ীর উপর। পুরনো, কোণায়-কোণায় ছিঁড়ে আসা আদির চলচলে পাঞ্জাবীর ভেতর দিয়ে দেখা যায় নতুন গেঞ্জী—মাস পয়লায় বড় ছেলে কিনে দিয়েছে। দু তিন দিনের

খোঁচাখোঁচা দাড়িতে ভাবনাগ্রস্ত তাঁর বার্ধক্য-মহৎ মুখ আরও কেমন যেন অসহায় মনে হচ্ছে।

আম্মাজানের মন ঝট করে অতীতে ফিরে যায়। তাঁর যখন শাদী হয়েছিলো, স্বামী ছিলেন দেখতে ইউসুফের মতো। নিজে ঠিক জুলেখার পর্যায়ে না হলেও তখন তাঁর শরীরেও লাবণ্যের কমতি ছিলো না। মুখের সেই লাবণ্য তখন 'দাম্মাজা' কেস ক্রিম মেখে তিনি আরো বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করতেন।

শাদীর পর শ্বশুর বেশীদিন বাঁচেন নি। তবে যে কয়দিন বেঁচে ছিলেন সে কয়দিন তাঁর ফুলহীন বিবিদের সুখ-সুবিধের দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিলো। মাঝে মাঝে তাতে আম্মাজানকে বেশ বিব্রত বোধ করতে হয়েছিলো। তারা ঘুমোবার সময় শ্বশুর সাহেব এসে দেখে যেতেন লেপটা তাঁদের গাঁয়ে ঠিক আছে কিনা; শ্বশুর সাহেবকে দেখে আম্মাজান লেপের ভেতর আরও জড়োসড়ো হয়ে শুতেন।

তবে তখন জওয়ানী ছিলো, সেহেতু্ ছিলো, সুখ ছিলো।

সংসারে হঠাৎ অঘটন দেখা দিলো—যখন পেটের কি এক বড় অসুখে শ্বশুর সাহেব মারা গেলেন। সেই সস্তার জামানাতেও তাঁদের অনেক কয়মাস ধরে শুধু্ ডাল-ভাত আলুভর্তা খেয়ে থাকতে হয়েছিলো। তাতে অবশ্য আম্মাজানের মনে গভীর কোনো ক্ষোভ জাগে নি। কারণ, প্রথম জীবনে সংসার পাওয়ার খুশীতে ও রূপবান স্বামীর আদর-যত্ন পাওয়ায় সাংসারিক কোনো অস্বচ্ছলতাকে তিনি তেমন পরওয়া করতেন না।

জাওয়ানীর এই দলিত সুখ বেশী দিন কিন্তু টিকলো না। শাদীর চার বছরের মধ্যে তিনটি ছেলে হওয়ায় শরীর অনেকটা ঢিলে হয়ে এলো এবং চিরকাল স্বচ্ছলতায় মধ্যে থেকে আসা স্বামী দৈনন্দিন অনটনের মুখোমুখি হয়ে নিজের খোশমেজাজও বেশী দিন বজায় রাখতে পারলেন না।

ছেলের সংখ্যা যতো বাড়তে লাগলো আম্মাজানের শরীরে সে অনুপাতে ভাংগন ধরলো—আর অনটনের কিস্সাও শেষ হলো না। স্বামীর ব্যবহার নির্দয় হতে নির্দয়তর হতে লাগলো। একটি ঘটনা এখনও আম্মাজানের স্পষ্ট মনে আছে।

মফঃস্বল থেকে অসুখ নিয়ে স্বামী ফিরে আসেন। নিজের বিছানায় টাঙ্গানো মশারীটি ফেলে আর লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকনে তিনি। এক সময় আম্মাজান, সংসারের কাজ কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে, স্বামীর সেবা করতে যান। তিনি ওঠেন খেঁচিয়ে। তা উপেক্ষা করেও যখন তিনি মশারীর ভেতর ঢুকতে গেলেন, তুমুল চীৎকার করে উঠলেন তিনি। বললেন ঃ বেরিয়ে যা হারামজাদী শীগগীর। নইলে লাথি মেরে ফেলে দেবো।

মুখ কালো করে আম্মাজান নেমে আসেন। নিজের প্রতি এই প্রথম গভীর ধিক্কার জাগে। মনে হয়, তাঁর নিজের কোনো সত্তা নেই, মানবোধ নেই। স্বামীর খোশমেজাজের উপর ভর করে সারা জীবন তাঁকে কাটিয়ে দিতে হবে। ভালো-মন্দ লাগার কথা তাঁর পক্ষে বিলাস শুধু।

তারপর থেকেই মাসে অন্ততঃ দু'তিনবার স্বামীর আচরণ দুঃসহভাবে অপমানজনক হয়ে উঠেছিলো। মাঝে মাঝে তিনি হুমকি দিতেন আর একবার বিয়ে করবেন। আম্মাজানকে তালাক দেবেন। তা শুধু হুমকি হলেও আম্মাজানের মনে নিদারুণভাবে বাজতো।

কখনও কখনও কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে বা গলায় দড়ি দিয়ে বা কূয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবার কথা তিনি ভাবতেন, তবে ছেলেমেয়েদের কথা মনে করে আর মনের ততটা জোর না থাকায়, ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ তিনি করতে পারতেন না।

সেই স্বামী ফুটফুটে ছয় বছরের একটি চঞ্চল স্বাস্থ্যবান ছেলে টাইফয়েড হয়ে মারা যাওয়ার পর থেকে দ্রুত বদলানো আরম্ভ করে দিলেন। আগে ছেলেমেয়েদের কখনও তিনি কাছে ডাকতেন না, আদর

করে কোনো কথা বলতেন না। কিন্তু সেই দুর্ঘটনার পর থেকে ছেলেদের সম্বন্ধে তাঁর এক আশ্চর্য ব্যাকুলতা দেখা দিলো। সেজ ছেলের পায়ে একটা অপারেশন করা যখন দরকার হয়ে পড়লো, তখন স্বামীর কাৎরানি দেখে আম্মাজানের বড় মায়া হোত। নিভৃতে স্বামী কোরান শরীফ তেলাওয়াত করতেন আর চোখ দিয়ে তাঁর আঁসু পড়তো অবিরত। খোদার কাছে মানত চাইতেন ছেলের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

তা' দেখে আম্মাজানের বাবর বাদশাহের কিস্‌সার কথা মনে হয়েছিলো, আর স্বামীর প্রতি গভীর মমতায় মন তাঁর ভরে গিয়েছিলো।

সময় হবার পাঁচ বছর আগেই স্বামী পেন্সন নিলেন—ছেলেদের ছেড়ে মফঃস্বলে থাকতে তাঁর মন আর চায় না। এখানেই ছিলো তাঁর আসল ক্ষোভ। চিরকাল শহরের সুখ-সুবিধেয় মানুষ। চাকুরী জীবনে চরকীর মতো মফঃস্বলে ঘুরে মন তাঁর ভিতরে ভিতরে বিষিয়ে উঠেছিলো। তার উপর অনেক সময় বাধ্য হয়ে একলা থাকবার শূন্যতায় নিজের জীবন তাঁর কাছে খুব ফাঁকা মনে হোত।

সেই স্বামী আজকে ছেলেদের নিয়ে আম্মাজানকে ঘিরে বসেছেন। তাঁকে দেখে আম্মাজানের শুধু এই দুঃখ হয়, বেচারা আজকাল ভালো তেমন কিছু খেতে পারেন না। হালুয়া, পুডিং, কবাব, পরোটা খেতে তিনি বরাবর ভালোবাসতেন। এখনও সেগুলি খেতে নিশ্চয় তাঁর সখ হয়, অথচ সামর্থের অভাবে আম্মাজান আর সেগুলি তাঁকে তৈরী করে খাওয়াতে পারেন না। বড় ছেলের প্রতি আম্মাজান এই কারণে কৃতজ্ঞ যে, বুড়ো বাপকে সে নিয়মিত অন্ততঃ এক বেলা হয় ভালো কোনো তরকারী বা কিছু মিষ্টি পাঠায়। খোদা তার হায়াত দারাজ করুন।

অতীতে স্বামীর আচরণের রূঢ়তাই আম্মাজান খেয়াল করতেন বেশী কিন্তু তার পেছনে কোনো কারণ আছে কিনা, তা ভেবে দেখা কোনোদিন দরকার মনে করেন নি। আজকে, জীবনের অনেক ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে এসে আর মওত-এর সঙ্গে প্রায় মুখোমুখি হয়ে স্বামীর প্রতি সামান্যতম

বিদ্বেষও তিনি বোধ করেন না। কথা তাঁর রূঠা হতে পারে, তবে মনে তাঁর কোনো ময়লা নেই। মাথার সামনে মালাকাল মণ্ডত দাঁড়িয়ে থাকলেও আম্মাজান তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে একথা বলতে পারেন যে, স্বামী তাঁর এমন হলে মরণের আগে মনে তার বরঞ্চ আফসোস্‌ই থেকে যেতো। বড় ছেলেও, তার দিকে তাকিয়ে আম্মাজান স্পষ্ট বুঝতে পারেন, তার মার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তিনি সেরে উঠুন, সংসার নিয়ে আবার জাঁকিয়ে বসুন—বড় ছেলের মনে যেন এই কথা।

চিরকাল বড় নরম-দিল তাঁর এই বড় ছেলের। স্বামী যখন আম্মাজানকে অবহেলা করতেন, তখন মার কাছছাড়া হতে চাইতো না বড় ছেলে। তাঁর গলা জড়িয়ে আবদার করতো কিস্‌সা বলবার জন্যে। আর তার বাড়তি বয়সে আম্মা ঠিকমতো খেলেন কিনা, না রাগ করে বিছানায় গিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকলেন, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতো। কখনও কখনও আম্মাজানের রাগ ভাঙাবার খায়েশ যখন আব্বাজানের হতো, তখন বড় ছেলেকেই তিনি কাজে লাগাতেন। বড় ছেলের সাধ্য-সাধনার সামনে আম্মাজানের রাগও বেশীক্ষণ টিকতো না।

দেশ-বিভাগ হয়ে যাওয়ার পর বড় ছেলে কলকাতাতেই থেকে গেলো। বাপের শহরে প্রবৃত্তি পেয়েছিলো বলে, না বুড়ো বাপ-মার হেফাজতির কথা ভেবে, তা অবশ্য ঠিক করে বলা যায় না। হয়তো প্রথমটাই আসল কারণ। তবে, আম্মাজানের স্থির বিশ্বাস, দ্বিতীয়টাও বড় ছেলের মনে নিশ্চয় অন্ততঃ উকিঝুঁকি মেরেছিলো।

নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও এবং টাকা পয়সার ব্যাপারে সম্প্রতি একটু হাতটান করলেও বুড়ো বাপমা'র খোঁজ করতে বড় ছেলে এখনো কসুর করে না। মাসে প্রায় ছয়শো টাকা আয় করে—তার থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত আম্মাজানকে তিরিশ টাকা গুণে দেয়। তা ছাড়াও ঈদ-বকরীদে তাঁদের শাড়ী পাঞ্জাবী কিনে দেয়।

তবে একটা কথা আম্মাজান ঠিক বুঝতে পারেন না। বড় ছেলের

একই ছেলে। দাদা-দাদীর বড় আদরের। কন্‌ভেন্টে ভর্তি হওয়ার পর থেকে সে আর তাদের কাছে তেমন আসে না। উড়তি খবর আম্মাজান শুনতে পান তার নিজের আসবার যথেষ্ট ইচ্ছে আছে, তবে তার আব্বা নাকি তাকে আসতে দেয় না। কারণ, তার সেজ চাচার—যে লেখাপড়া শিখেও বাপমায়ের সঙ্গে এখনও থাকে—মেজাজ নাকি খুব খারাপ।

এই যদি আসল কারণ হয়, আম্মাজান মনে মনে ভাবেন, তবে সেটা তাঁর পক্ষে বড় দুঃখের কথা হবে। বড় ছেলের মনের মধ্যে কি আছে, তা অবশ্য সঠিক তিনি জানেন না, তবে ভাইয়ের বদমেজাজীর কথা ভেবে নিজের ছেলেকে যদি তার দাদা-দাদীর কাছে আসতে দিতে বড় ছেলে না চায়, তবে তাদের প্রতি বড় ছেলে কিছুটা যেন অবিচার করবে।

অবশ্য, সেজ ছেলের থম্‌থমে ও কিছুটা বিহ্বলিত মুখের দিকে চেয়ে আম্মাজান মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হন, সেজ ছেলেটা তাঁর অদ্ভুত হয়েছে। লেখাপড়ায় ভালো ছিলো। বি-সি-এস পরীক্ষা দিয়ে পাশও করে ছিলো, তবে মুখের এমতেহান (ভাইভা) যেদিন হবে, সেদিন সময়মতো যেতে পারে নি। পরীক্ষকরা তার দেরী করে আসবার কারণ জিজ্ঞেস করায় সে জবাব দিয়েছিলো, ওাদের জেনে দরকার নেই।

স্বামী থেকে সেজ ছেলে পেয়েছে তাঁর রগ-চটা স্বভাব ও সরল মন। তবে পাশটাশ করেও কোনো চাকরি না করায় প্রথমটাই সকলের নজরে আসতো বেশী, দ্বিতীয়টা কেউ তেমন তলিয়ে দেখতে চাইতো না। কেউ যদি দেড়শো-দু'শো টাকা মাইনের চাকরির খবর তার কাছে নিয়ে আসতো, নাক সিঁটকিয়ে সে বলতো: চাকুরি যদি করতেই হয়, তবে অন্‌থা অন্ততঃ শ'পাঁচেক হওয়া দরকার—তার কম মাইনের চাকরি করলে তার ইজ্জতের হানি হবে।

আম্মাজানও প্রথম প্রথম সেজ ছেলেকে অনেক বুঝিয়েছেন: চাকরি নিয়ে বিয়েথা' করে সে এবার একটা সংসার পাতুক। উল্টো সেজ ছেলে

তাঁকে বকেছে ঃ ঐসব হাবিজাবি চাকরি করবার জন্তে সে জন্মেছে নাকি। ওই ধরনের চাকরির কথা যেন তাকে আর বলা না হয়।

ফলে হয়েছে এই, ঘরের এক কোণে ছেঁড়া ও ময়লা বিছানায় প্রায় সে পড়ে থাকে, গেলাফহীন নানা-দাগ পড়া বালিশে মাথা দিয়ে। নিজের সঙ্গে কথা বলে বা শূন্যে আঙুল দিয়ে কি সব লেখে এবং প্রায়ই গলার স্বর বেশ চড়িয়ে গান গায়।

আম্মাজান গানের তেমন সমঝদার নন ; তবে আর সকলের মুখে শুনেছেন, সেজ ছেলের গলা ভালো। কিন্তু কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে, রেডিওতে গান দেবে কিনা। গভীর অবজ্ঞার ভঙ্গী করে সে বলে ঃ আমি দেবো রেডিওতে গান ? হয়তো কথাটা আর একবার বললে সে রাজী হোতো ঃ কিন্তু অনাত্মীয়ের এমন কি দায় পড়েছে তাকে খোশামোদ করবার।

সেজ ছেলের হাত-খরচা বড় দুই ভাই মিলে তাকে দেয়। হাত-খরচার সব কিছুই সে সিনেমা দেখে বা রেস্তোরাঁয় খেয়ে উড়িয়ে দেয়। নিজের পায়জামা, সার্ট বা স্যাণ্ডেলের দরকার হলে আম্মাজানের কাছে ছোটো বোন মারফৎ খবর পাঠায়। যদি আম্মাজান তার কথামতো কাজ না করতে পারেন, তবে তাঁকে খিস্তি সব গাল দেওয়া আরম্ভ করে দেয়। নাচার হয়ে মুখ বুঁজে আম্মাজানকে এখন সে সব শুনতে হয়। প্রথমে প্রথমে তম্বি করবার চেষ্টা করতেন। তবে তম্বি করবার দরুণ সেজ ছেলে একদিন তাঁর চুলের গোছা—ক্ষীণ ও সাদা-কালো—টেনে ধরে তাঁর মাথা থেকে কয়েক গাছি চুল ও কিছুটা রক্ত বের করে নিয়েছিলো। তাই তম্বি করতে তিনি আর ভরসা পেতেন না।

মেজ ছেলে ছোটো ভাইয়ের এই হালৎ লক্ষ্য করে রায় দেয় ঃ এত বয়সেও বিয়ে করতে পারে নি বলেই মনে তার এই বিকার। কোনোমতে যদি তাকে চাকরি করাতে রাজী করানো যায় এবং পরে তার পছন্দমতো

বউ জোগাড় করে দেওয়া যায় (আম্মাজান জানেন, সেটাও বড় সহজ কাজ হবে না), তবে তার মনের সুস্থতা আবার ফিরে আসবে।

দ্বিতীয়টাই কিন্তু নিজের জন্য সেজ ছেলে প্রথমটার চেয়ে বেশী দরকারী বলে মনে করে। পাশের বাড়ীর এক মেয়ে তার দিকে হয়তো দু' একবার চেয়েছে। তা' থেকেই সেজ ছেলের ধারণা হয়েছে, মেয়েটা তার ঘোরতর প্রেমে পড়ে গেছে। নিজের শাদীর প্রস্তাব ছোটো বোনের মারফৎ নিজেই আম্মাজানের কাছে পাঠায়।

আম্মাজান সচকিত হয়ে ছোটো মেয়ে মারফৎ বলে পাঠান : আগে চাকরি হোক, তারপর না বিয়ে। সে কথা শুনে সেজ ছেলে আবার ক্ষেপে যায়। বলে : মেয়েটার বাপের বিস্তর পয়সা আছে, তার আবার চাকরি করা দরকার কিসের।

আত্মীয়মহলে তেমন কোনো আমল না পেয়ে এবং তাদের সকলকেই নিজের জান-দুশমন বলে মনে করে সেজ ছেলে নিজেই মেয়ের বাপের কাছে গিয়ে একদিন বলে : আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হোক, আমাদের Destiny এই চায়।

মেয়ের বাপতো তাজ্জব এবং সে ভাব কেটে যাওয়ার পর রেগে আগুন : এক্ষুণি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও শুয়োর কোথাকার, আবার যদি এ-পথ মাড়াও, তোমার নামে তাহলে আমি মকদ্দমা করবো।

তার জবাবে সেজ ছেলেও নাকি প্রচণ্ড হুম্‌কি দিয়ে উঠেছিলো। তার আব্বা নিজে গিয়ে মেয়ের বাপের কাছে মাফ চাওয়াতে এবং ছেলের কিছু মাথা খারাপ, সেটা তার আচরণের কৈফিয়ৎ হিসেবে দেখানোতে, ব্যাপারটা কোনোমতে ধামাচাপা পড়ে গেছলো—নতুবা কোর্ট পর্যন্ত গড়াতো।

সেই সেজ ছেলেই, ব্যর্থতাবোধে মন যার এখন এমন বিকারগ্রস্ত—আম্মাজানের সাম্প্রতিক অসুখটা যখন খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিলো,

তখন তাঁর পাশে এসে বসে ভাঙ্গা গলায় বলেছিলো: আম্মা এবার আপনি ভালো হয়ে উঠুন, আমি আর পাগলামি করবো না।

সেই কথা শুনবার পর মা হয়ে কি করে তিনি সেজ ছেলের প্রতি, মওতের দরজায় প্রায় এসে, বিরক্ত থাকতে পারেন। তার জওয়ানী ও জওয়ানীর সমস্ত সাধ যে প্রায় ব্যর্থ হতে বসেছে, তা সেজ ছেলে নিজের মনে নিশ্চিতভাবে বুঝে। এও সে বুঝতে পারে, অবুঝ ও সহানুভূতিহীন এই দুনিয়ায় আম্মাজানই তার একমাত্র দরদী হিতাকাঙ্খী। তাই তাঁর মৃত্যু-সম্ভাবনায় সে এতো বিচলিত হয়ে উঠেছিলো।

মওত্-এর পর যদি অন্য কোনো জীবন থাকে, তবে সে জীবনে সেজ ছেলের কিছুটা বিষাদগ্রস্ত, কিছুটা উদভ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে আম্মাজানের প্রতীতি জন্মে, তাঁর এই আধা-পাগলা বাচ্চা তার সাদা মন নিয়ে মোটামুটি সুখিই হোতে পারবে। কারণ, সেখানে তো বাইরের খোলশ দেখে কেউ জিনিসের কিমৎ ঠাওরাবে না,—বদ নসীবকে বদ স্বভাব থেকে আলাদা করে দেখবে।

আম্মাজান আরও দোয়া করেন: তাঁর মারা যাওয়ার পরে সেজ ছেলে যেন বেশী দুঃখ না পায়, অন্ততঃ তার ভাইরা যেন তাকে খুব বেশী অবহেলা বা অনাদর না করে।

মেজ ছেলে, আম্মাজানের নিশ্চিত বিশ্বাস, অন্ততঃ করবে না। তাঁর এই স্বল্প-ভাষী ছেলেকে বাইরে থেকে যতই নিরাসক্ত দেখাক-না কেন, কলিজা তার বড় আছে এবং বিশেষ করে ছোটো ভাইয়ের প্রতি—বাইরে তা প্রকাশ না করলেও তার গভীর এক মমতা আছে।

পাকিস্তান হওয়ার পর কোলকাতায়, এবার-নিয়ে সে এসেছে মাত্র দু'বার। আম্মাজানের শরীর খুব খারাপ—এ খবর না পেলে এবারও হয়তো সে কোলকাতায় আসতো না। অথচ কোলকাতার প্রতি, আম্মাজান জানেন, এককালে তার কি গভীর এক টান ছিলো।

শীতকালে ভোর পাঁচটায় সময় বিছানা ছেড়ে সে ঘোর রোজের মাঠে

বেড়াতে যেতো। বিকেলে তাদের পার্ক সার্কাসের বাড়ী থেকে হেঁটে, চৌরঙ্গী পর্যন্ত বেড়াতে যেতো। একদা আম্মাজান মেজ ছেলেকে তার এক বন্ধুকে বলতে শুনেছিলেন, সে যে এতোটা পথ হেঁটে যায় তা' শুধু সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখবার জন্ত। নিউ পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে ফুটপাতে বেঞ্চির উপর বসা এক-সিঙ্গেল চা-পান-রত ও খোশ-গল্প-করা কোচোয়ান, বেয়ারা, রিক্সাওয়ালার জমায়েৎ; পার্ক ষ্ট্রীটের পরিপাটি দোকানগুলি ও হঠাৎ-দেখা কোনো শ্বেতাঙ্গিনীর ঝলসে-দেওয়া রূপবহ্নি; চৌরঙ্গীর আশ্চর্য ভিড় ও অফুরন্ত লাস্ত। আম্মাজান মেজ ছেলের কথার মর্ম ঠিক বুঝতেন না; তবে কোলকাতাকে যে সে খুব ভালোবাসে সেটুকু আঁচ করতে পারতেন।

বদলী হয়ে তাকে দু' একবার যখন কোলকাতার বাইরে যেতে হয়েছে তখন তার চেহারা দেখে আম্মাজানের দুঃখ হতো। সেই মেজ ছেলে হিন্দুস্থান পাকিস্তান হওয়ার পর কোলকাতায় আর আসবার নামও করে না। তার দিকে মায়ের অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলেও আম্মাজান বুঝতে পারেন না, মনে তার কোনো দাগ-কাটা ক্ষোভ আছে কিনা। নতুন পাওয়া ইত্‌বারের জোরে কোলকাতা হারাবার দুঃখকে সেজ ছেলে যদি ভুলে থাকতে পারে, তবে তো ভালোই। একটি জিনিস কিন্তু আম্মাজানের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে: যে দুনিয়া তাঁর পরিচিত ছিলো তা সহসা কি করে যেন তাঁর সামনে থেকে বেমালুম সরে গেছে—তাঁকে কিছুটা একা ফেলে রেখে দিয়ে।

তবে, আম্মাজানের মনে আশ্চর্য এক চিন্তা জাগে: মণ্ডল্-এর পর যেমন এক নতুন জীবন, তেমনি তিনি যে-জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন, তার বদলেও নতুন এক জীবন আসবে। সেই জীবনেরই সম্ভাবনা বহন করছে একপাশে জড়িয়ে সড়িয়ে-বসা ও কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে-থাকা তাঁর ছোটো মেয়ে। আম্মাজান যে কখনো মারা যেতে পারেন, তা ছোটো মেয়ের বিশ্বাসই হয় না। সে-কথা আম্মাজান তুলতেই ছোটো মেয়ে মধুর হেসে

(আর তখন তাকে দেখতে অনেকটা ফেরেস্তার মতো লাগে)' বলে : যাঃ, আপনি মরবেন কেন।

—মরতে তো হবেই রে একদিন।

যেন খুব আমোদিত হয়েছে এই ধরনে নাকটা কিছু উঁচিয়ে তারপর ফিক করে হেসে ছোটো মেয়ে বলে : আগে আমি বড় হয়ে নি, কলেজে যাই, তারপর আপনি মরেন।

নিত্য অভাবের মধ্যে থেকেও ছোটো মেয়ের মনে এই আশ্চর্য প্রফুল্লতা ভোরের শোভার মতো, তার মধ্যেই আত্মাজান অনুভব করেন, নতুন এক জীবনের কচি চারা লুকিয়ে আছে। সে-জীবন যেন সমস্ত মলিনতা ছাড়িয়ে তাঁর ছোটো মেয়ের মতো হাস্যমুখী হয়ে ওঠে।

অবশ্য আত্মাজান জানেন, হাসিকে অনেক সময় আঁসু দিয়ে কিনতে হয়। তাঁর ছোটো মেয়ের যেমন হাসি বড় মেয়ের তেমনি কান্না। মায়ের কঠিন অসুখের খবর পেয়েও আসে নি—হৃদয়ে বড় মেয়ের এমনি এক ভারী পাথর ঝুলছে।

এখন ঝালকাঠিতে আছে। স্বামীর ঘর করছে অথচ স্বামীর উপর নিদারুণ বিরক্ত। মোটামুটি রূপসী ছিলো, তবে পড়ালেখা বেশী শেখেনি বলে জোতদারের এক ঘরে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। প্রথম প্রথম ভালোই ছিলো যেন—স্বামী এগারো বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও। ছেলে হওয়ার পর সংসারে মনও বসেছিলো এবং স্বামীর গোলায় কত ধান আর পুকুরে কত মাছ, তা বান্ধবীদের কাছে রসিয়ে রসিয়ে গল্প করতো। স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে নাকি, লোকে বলে, বড় মেয়ের মতি গতি ঘুরে যায়। বন্ধুটি শোনা যায় খুব চট্‌পটে ও সুশ্রী ছিলো। তারই সঙ্গে মনে মনে স্বামীর তুলনা করে বড় মেয়ের হয়তো নিজের বিবাহিত জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মেছিলো।

যে-কারণেই হোক, তারপর থেকে তার মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন এলো। সেটা প্রথমে ধরা পড়লো যখন ছেলেকে ছোটো ছোটো কথায় সে

মারধোর আরম্ভ করে দিলো। তারপর চুলে তেল দেওয়া বন্ধ করলো, একমাস ধরে একই চাদর বিছানায় পেতে রাখলো। সপ্তাহে একবারের বেশী গোসল করা ও শাড়ী বদলানো ছেড়ে দিলো। স্বামীকে বিনা কসুরে কুৎসিত সব গালিগালাজ করা আরম্ভ করে দিলো।

ঝালকাঠির লোকেরা ছলামিয়াকে অনেকবার বলেছে আর একবার বিয়ে করতে। তবে সে-কথায় ছলামিয়া কখনও কান দেয়নি, আর বউকে এখনও আদরে ও যত্নে রেখেছে।

বড় মেয়েকে আম্মা কতবার বুঝিয়েছেন। তার জবাবে সে অভিমান করেছে: আম্মাজানই তার জীবন বরবাদ করে দিয়েছেন, কোন্ মুখে আবার তিনি তাকে নসিহৎ শুনাতে ও উপদেশ খয়রাৎ করতে আসেন? সে জবাব শুনে আম্মাজানের মুখ কতবার কালো হয়ে গেছে।

তাঁর নিজের ভুলের জন্যেই বড় মেয়ের মনে যদি এমন দাগ লেগে থাকে, তবে আম্মাজান কসম খাচ্ছেন, তার জন্যে খোদাতালার যে কোন গজব তিনি মাথা পেতে নিতে রাজী।

বড় মেয়ে তাঁকে হয়তো মাফ করতে পারে নি—নইলে তার এতবড় অসুখের খবর পেয়ে নিশ্চয় একবার আসতো। তার জীবনে সুখ ফিরিয়ে আনবার জন্য আম্মাজান মণ্ডতকেও কোলে টেনে নিতে পারেন —এর চেয়ে বেশী কিছু করবার তাঁর তো আর নেই।

এ-ফাড়াটা কেটে গেলেও, আম্মাজান নিশ্চিত বুঝতে পারেন, তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না। মণ্ডতকে কিন্তু তিনি এখন আর ডরান না। জীবনে তাঁর যা দেবার ছিলো, তা তিনি দেবার চেষ্টা করেছেন, তার বদলে জীবন থেকে তিনি যা পেয়েছেন, তার কিম্মৎও কম নয়।

চাঞ্চল্যকর কোনো ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে নি। এমন কিছুও তিনি করেন নি যে, তাঁর মারা যাওয়ার পর তাঁর আত্মীয়স্বজনের বাইরে কেউ তাঁকে কয়েকদিনের জন্যও মনে রাখবে। তবুও সেজন্যে তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ নেই। ছনিয়ার বেশীর ভাগ লোকই তো এমন করে মরে;

তাই বলে কি তাদের সকলের বেঁচে থাকা নিরর্থক? মওত্‌-এর পর তো সকলই সমান! সেখানে আমাদের ছোটোখাটো মন আর ছোটোখাটো থাকবে না।

আর এখন, স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে এই উষ্ণ পরিবেশ, বড় মেয়ের প্রতি মমতার যে ঘোর—তার দামই-বা কে দেবে। মালাকাল মওত্‌-এর কব্জা থেকে ছাড় পেয়ে ফিরে এসে এই পরিবেশই যদি পাওয়া যায়, তবে কে এমন বেকুফ আছে যে, মওত্‌-এর দরজার কড়া সখ করে নাড়তে যাবে?

জিন্নত মহলের আপাজান

দুই বোন দুই রকম। রাশেদা বড়, পড়া লেখায় ভালো, সুন্দরী ও নম্রস্বভাবা। প্রত্যেকের মুখেই শোনা যায় তার দিলখোলা প্রশংসা। এত জেহেন যার, লোকে ভাবে, তার স্বভাবও কি এত মধুর হতে হয়। তার যে কোনো গুণ আছে একথা কখনও জিন্নত মহলের খেয়াল হয় না; সে মোটর নিয়ে ছুট দিতে গিয়ে হয়তো টকরই লাগিয়ে বসলো কিছুর সঙ্গে; একবার মাথা ভাঙা সত্বেও আগেকার মতোই প্রবল উৎসাহ নিয়ে সে এখনও ঘোড়ায় চড়ে। আত্মীয়দের মধ্যে যাঁদের পিছনের দিকে চোখ তাঁরা নাক সিঁটকান. বলেন: ধিঙ্গী মেয়ের কি বাহার, ও মেম সাহেবকে শাদী করবে কোন্ গামা পাহ্লওয়ান, মরদানী একদম, বাপ-মায়েই বা কি করে এত ঢিলে দেয়।

এ-সব কথা জিন্নত মহলের কানেও মাঝে মাঝে যায়। বেশীর ভাগই গায়ে মাখে না, কখনও সহসা যদি বেজায় রাগ হয়ে যায় সেতার নিয়ে বসে এবং তাতে অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়। কাছে পেলে অবশ্য সে শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না।

—আমার শাদী হবে কিনা হবে তা নিয়ে আপনাদের চোখে ঘুম নেই কেন? আপনাদের কোনো ছেলে বা ভাগ্নেকে তো আমি মজাই নি। জিন্নত মহলে বলে।

—তওবা আসতাগফারুল্লা, কি বেহায়া মাগী, মুখে যা আসে তাই বলে দেয়। মুরুব্বী একজন হয়তো চিল্‌বিলিয়ে বলেন।

আর একজন ফোড়ন কাটেন : হবে না, বাপ যেমন মেয়েও তো তেমনি হবে। সে কথা শুনে জিন্নত মহলের রাগ আরও দশগুণ বেড়ে গেলেও সে আর কিছু বলে না, কারণ সেখানেই তার দুর্বলতা।

বস্তুতঃ আব্বাজান লোক চমৎকার হলেও স্বভাবদোষ তাঁর সর্বজন-বিদিত। উচ্ছৃংখলতার দরুণ দেউদারু গাছের মতো তাঁর সেই বিশাল ও অটুট শরীর এখন হাজারো বজ্রাঘাতের চিহ্ন বহন করছে। শরাবও তিনি খান। দুই অনাচারের দাপটে শরীর তাঁর নুয়ে পড়েছে ও মনেও ভাঙন ধরেছে।

অথচ আর সব ব্যাপারে আব্বাজানের মতো আর দুটি লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব সময় মুখে হাসি; সন্তানদের পেছনে নিজেকে বিলিয়ে দেন যখন নেশার ঘোর কাটে; কোনো মেহমান তাঁর বাসায় এসে অপ্রসন্ন মনে ফিরে যায় নি। এক মন্দস্বভাবা মেয়েদের মন্দ করা ছাড়া তিনি জীবনে আর কারও ক্ষতি করেন নি; বরঞ্চ নিজের দুশমন-দেরও ভালো করতে সতত সচেষ্ট।

সেই আব্বাজানের দুর্বলতা নিয়ে কেউ যখন বক্রোক্তি করে তখন নিদারুণ রাগে ফুলতে থাকে জিন্নত মহল অথচ কিছু বলবার নেই বুঝতে পেরে তার সে রাগ কান্না হবার উপক্রম করে।

আম্মাজানের গলা আচানক জড়িয়ে জিন্নত মহল শুধায় : এত যে সাজ করি আম্মা তবুও আমার মুখে কি যেন নেই, বড় খিঙ্গী দেখতে আমায়, না আম্মা ?

সংসারের সব ধাক্কা আম্মাজানের ওপর দিয়ে প্রধানতঃ যায় বলে এবং তাঁর দাম্পত্য-জীবন সুখময় না হওয়ায় বিষণ্ণতাই আম্মাজানের চির-সাথী—সে বিষণ্ণতাকে দূর করবার চেষ্টা তিনি করেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টায় এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে।

জিন্নত মহলকে বুকে টেনে ফুলন্ত গালে এক নিবিড় চুমো খেয়ে আম্মা বলেন : আমার চোখে তো তোর মুখ রওনাক ভরা মনে হয়। আমি কি তোকে কখনও খিঙ্গী বলতে পারি মা।

—ওঃ, চোখ দুটো বড় করে জিন্নত মহল বলে, জানো যে আমি খিন্সী, তবে দুঃখ্ পাবো বলে সে কথা আর মুখ ফুটে বলো না ঃ এই তো !

—তুই যখন মা হবি বুড়ী মেয়ে আমার, তখনই মায়ের মনের কথা বুঝবি। বলে আম্মাজান হয়তো ওজু করতে চলে যান।

ভাইটা হয়েছে যাকে বলে হাবা। রাশেদার ছোটো, জিন্নতের বড়। গণ্ডারের মতো গায়ের জোর ; মাথায় বলদের মতো বুদ্ধি। খেলাতে ওস্তাদ, পড়াতে সকলেরই সাকরেদ। পাঁচবার চেষ্টা করেও ভাই বেচারা ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলো না। মুখে কিছু না বললেও ভিতরে ভিতরে আব্বা ও আম্মাজান উভয়েই তাঁদের একমাত্র ছেলের ব্যর্থতায় গুমরে মরেন। শাদী হওয়ার পরে মেয়েরা, এখন যতোই আপন থাক, পর তো হয়েই যাবে শেষ পর্যন্ত, অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে নিজের থাকে একমাত্র ছেলেই। অথচ রওশনই, তাঁদের মলিন স্মৃতিকে যে ভাবীকালে উজ্জ্বল করে তুলতে পারতো, এমন হলো—খোদার একি খেয়াল! বোনরাও ভাইয়ের জন্য বড় আফসোস করে। অথচ এ সব চিন্তা রওশনের নিজের মনে কখনও জাগেই না। নিজেদের মটর ড্রাইভারের সঙ্গে সে অত্যন্ত গর্হিত রসিকতা করতেও দ্বিধাবোধ করে না—কারণ মন তার বিলকুল ফাঁকা। হঠাৎ একদিন, কথা নেই বার্তা নেই, রেগেমেগে একজনের হয়তো মাথাই ফাটিয়ে দিলো। পরে যখন ঠাণ্ডা হওয়ার পর তার বিচিত্র আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করা হলো, সে জানান দিলো যে, মাথা-কেটে যাওয়া লোকটা রাশেদা আপার দিকে কুনজর দেবার মতলবে ছিলো। সকলে তো তার কারণ ব্যাখ্যা শুনে তাজ্জব বনে যায়।

যেখানে রাশেদা আপার কথা সেখানে সকলেই গদগদ। এমন কি বুদ্ধিহীন রওশনও। চারদিকের সিক্ত কাদা ভেদ করে একটি গোলাপ ফুল যেন ফুটেছে ; তার রূপকে অপরিম্লান ও সৌরভকে তাজা রাখবার জন্য তাই সকলের এতো বিরামহীন আয়োজন। কলেজে যে যায় রাশেদা কোনো দিন রঙীন শাড়ীও পরে না বা চুলের কোনো হাল-

ফ্যাসানের বিন্দুনিও করে না। ক্লাশে গেলে কখনো চোখ তুলে কারও দিকে তাকায় না। সিঁড়ি দিয়ে নামা বা ওঠার সময় কেউ যদি তার দিকে ভেরছা দৃষ্টিতে তাকালো তো ত্রস্তা হরিনীর মতো মনও তার কেঁপে উঠলো। সবচেয়ে তার অসুবিধে হয় ইংরেজী টিউটোরিয়াল ক্লাশ-এ। মিশ্রিত ক্লাশ; সাতজন ছেলের সংগে তিনজন মেয়ে। মেয়েরা জড়োসড়ো হয়ে থাকে। অধ্যাপক সাহেবও চাকরীতে সন্ত ঢুকেছেন। বয়স কাঁচা; মুখের গম্ভীর ভাবকে ছাড়িয়ে তাঁর বাচপানা মাধুর্যই মেয়েদের চোখে পড়ে বেশী। এমন কি রাশেদাও সেটা লক্ষ্য না করে পারে না। তবুও মাষ্টার সাহেবের দিকেও তার তাকাতে ভয় হয়, পাছে নিজেরই অজান্তে তার দৃষ্টিতে অন্য কোনো ভাব ফুটে ওঠে। অথচ এ টিউটোরিয়াল ক্লাশ থেকে অনুপস্থিত হতেও মন চায় না রাশেদার। ভাগ্যিস সঙ্গিনীরা রাশেদার এই ডবল-সঙ্কটের কথা আঁচ করতে পারে না, নইলে রাশেদার কলেজে আসা বন্ধ হয়ে যেতো হয়তো।

আব্বাজানের প্রতি প্রগাঢ় মমতায় যেমন রাশেদার মন ভরা তেমনি রাশেদারও প্রতি অতল স্নেহে আব্বাজানের হৃদয় ভরপুর। রাশেদা ভাবে: আব্বাজান যদি শরাব খাওয়া ছেড়ে দিতে বা স্বভাব-দোষ কমিয়ে ফেলতে পারতেন তবে তাদের সংসার কি সুখের জায়গাই না হতো। আব্বাজান ভাবেন: নিজের জীবন তো মিসমার হয়ে গেলোই; ছেলেটাও হাবা জন্মালো; এখন রাশেদাই খালি তাঁর মধ্যে যা ভালো, ও তাঁর যে সুপ্ত স্বপ্ন তা জীয়িয়ে রাখতে পারে। তাঁর জীবনের গ্লানি একমাত্র রাশেদাই ধুয়ে মুছে ফেলে তাঁর স্মৃতিকে সৌরভে ভরে দিতে পারে। যদি খালি, যখন আব্বাজানের নেশা কেটে যায় তখন তিনি ভাবেন, রাশেদার উপযুক্ত এক দামাদ পাওয়া যেতো। এতো ভালো মেয়ে রাশেদা, বলতে গেলে খুঁত কিছুই নেই, তার জন্য, আশ্চর্য, তেমন পয়গাম আসছে না কিন্তু। সেটা নেহাৎ তাঁর নিজের বদনামীর জন্য।

যদি রাশেদার ভবিষ্যৎ সুখোজ্জ্বল না হয়, সেজন্য তিনি নিজেকে মৃত্যুর পরও দায়ী মনে করবেন।

আব্বাজানের দুঃখ কোথায় ওদিকে রাশেদাও সেটা ধরতে পেরেছে। আম্মাজান অনেক দিন থেকেই নিজেকে নামাজ ও এবাদতের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন। তাঁরও দুঃখ কম গভীর বা জ্বালাময়ী নয়, রাশেদা জানে। তবুও আব্বাজানেরই মমতা বেশী দরকার কারণ শরাব ছাড়া দুঃখ ভুলবার জন্য কোনো অবলম্বন তো তাঁর নেই। আম্মাজান তো আল্লার দরবারে নিজেকে সমর্পণ করে এক রকম স্বস্তিতেই আছেন বলতে গেলে, সে স্বস্তির পেছনে যতোই বেদনা থাক না কেন। তবে আব্বাজান যখন চেতনায় থাকেন কি গভীর মর্মজ্বালায় তাঁর মন পুড়ে খাক্ হয়ে যায় তাও রাশেদার অজানা নেই। তাই আব্বাজানের ভবিষ্যৎ, তাঁর সুস্থ ও স্বাভাবিক রূপে, কিভাবে বদলানো যায় সে দিকেই উদ্ভিন্নযৌবনা রাশেদার খেয়াল যায়—তার প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো শান্ত ও কোমল শ্রীকে সেজন্যই সে নিজের খোলসের আবরণে সযত্নে ঢাকা রাখে। এখন যদি আচমকা বসন্ত হুড়মুড় করে এসে হাজির হয় বিচিত্র সব কল্পনাতীত সম্ভার নিয়ে, তবে বড়ই অপ্রস্তুত বোধ করবে রাশেদা, বড়ই শরমাবে সে।

দু'বোনের মধ্যে আশ্চর্য ভাব।—তোমার মতো সুন্দর যদি আমি হতাম আপা, জিন্নত মহল অনেকটা কৃত্রিম আক্ষেপের ভঙ্গীতে বলে, তবে আমি নিজেকে এমনভাবে ঢেকে রাখতাম না, ছেলেদের মাথা চিবিয়ে খেতাম।

—হজম হতো? মধুর ভঙ্গীতে ভ্রূ তুলে শুধায় রাশেদা।

—এক নিশ্বাসে যখন ছয়টা কলা খেতে পারি তখন এক চোকে দু'জন ছেলের চিবানো মাথা খেয়ে হজম করা এমন কি কঠিন কাজ, তবে ছেলেরা যে আমাকে তাদের মাথা চিবাতেই দেবে না, কম দুঃখ হয় আপা।

—তোর জন্য এমন এক লোক আমরা এনে দেবো যায় সুখের দিকে

চাইলেই তুই অন্য সব কথা ভুলে যাবি। সান্ত্বনার ভঙ্গীতে রাশেদা বলে।

—কে সে লোক আপাজান, দুষ্টুমীতে ঝিলমিলিয়ে ওঠে জিন্নত মহল, তোমাদের নতুন মাষ্টার সাহেব নাকি ?

শ্বেতপদ্মে রঙীন একটু আভা দেখা যায়, তবুও ঠাট্টার ভাব বজায় রেখে রাশেদা জিজ্ঞেস করে—দেখেছিস তাকে, পছন্দ হয় ?

—ও তো ঝিঙে ফুল আপাজান, এক আঘাতেই ভেঙে যাবে, ওকে দিয়ে আমার চলবে না। জিন্নত মহল রেখে ঢেকে কথা বলে না।

—তবে কাকে দিয়ে হবে বল্ ? রাশেদা জানতে চায়।

—ওই যে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসবে শাহজাদা......

ছোটো বোনকে তার কথা সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে রাশেদা বলে ওঠে : আর তোকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে দেবে ছুট আমরা পেছনে পেছনে সে শাহজাদার ধাওয়া করবো হাওয়াই গাড়ীতে চড়ে।

—তাহলে কিন্তু, মুখটা কেমন ঝিলিক-খাওয়া মেয়ের মতন করে জিন্নত মহল বলে, নেহাৎ মন্দ হয় না আপা।

রাশেদা এবার গাল ফুলিয়ে না হেসে পারে না।

আব্বাজান ঘরে এক আজব চিজ্ পোষেন। মানুষের মুখোসই তার তবে তার মেয়ে ও মদ নিয়ে কারবার। ঘরে কেউ তাকে তেমন দেখতে পারে না তবে আব্বাজানের খাতিরে কেউ কিছু বলতেও পারে না। একমাত্র জিন্নত মহলের সঙ্গেই তার কিছু ভাব। জিন্নত মহলকে তার পছন্দ মাফিক অনেক জিনিস এনে উপহার দেয় কাদের। দেখতে সে খুব সুশ্রী বলে মেয়েদের মন সে সহজেই টান্‌তে পারে। জিন্নত মহলকে খুশী করবার জন্য কতো রকম উদ্ভাবনা যে তার মাথায় খেলে, তার কিছু হিসেব নেই। ক্যামেরা কিনে এনে উপহার দেয় ; শাড়ীও। তাকে নিয়ে পিক্‌নিক্ করতে বেরিয়ে যায়, সিনেমা দেখে, মোটরে করে শহরের উপকণ্ঠে দেয় দৌড়।

রাশেদার চোখে এসব কিন্তু ভালো লাগে না। জিন্নত মহলকে আভাসে জানায় কাদেরের মতো ছেলের সঙ্গে এতো মাখামাখি করবার পরিণতি ভালো নাও দাঁড়া ত পারে। এই একটি ব্যাপারে কিন্তু জিন্নত মহল অপর কারুর কথা শুনতে চায় না। তাই আপাজান এ-সম্বন্ধে ইঙ্গিতে কিছু বললে মনে মনে সে চিলবিলিয়ে ওঠে এবং কাদেরের সঙ্গে আরও মাখামাখির ভাব দেখায়। কখনও কখনও এমন সন্দেহও তার মনে দেখা দেয় যে কাদের তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে দেখে হয়তো আপাজান তাকে ঈর্ষা করতে আরম্ভ করেছেন। তাতে তার জেদ আরও বাড়ে।

আম্মাজান কাদেরের সঙ্গে জিন্নত মহলের ঘনিষ্টতা, অনেকটা লোক দেখানো হলেও, বিলকুল পছন্দ করেন না; সংসারের সব ব্যাপারে সর্বনেশে ঔদাসীন্যের জন্য এ-নিয়ে মুখে কিছু বলা তিনি দরকারও মনে করেন না। খোদাতালার উপরই তিনি সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন; পাক-পরওয়ারদেগার যা করবেন তাই হবে। আব্বাজান মনে মনে ভাবেন যে তাঁর প্রিয় অনুচর কাদেরের সঙ্গে জন্নত মহলের বিয়ে হলে মন্দ হয় না। কথাটা একবার তিনি গিন্নী ও রাশেদার কানেও তুলে-ছিলেন তবে উভয়েই প্রবলভাবে আপত্তি জানায়। নিজের দায়িত্বে কিছু করার মতো মনোবল তাঁর অবশিষ্ট ছিলো না বলে এ-ব্যাপারে আব্বাজান আর বেশী গা দেন নি।

নতুন অধ্যাপক সাহেব, শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, রাশেদার কেমন আত্মীয় হন। একদিন সহসা তিনি তার ফুপু আম্মার খোঁজে রাশেদাদের বাসায় এসে হাজির হয়ে নিজের ছাত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি হন। রাশেদা তো অবাক। তার বিব্রত ভাব বুঝতে পেরে অধ্যাপক সাহেব তাকে বাঁচালেন এই প্রশ্ন করে: ফুপু আম্মা আছেন? তাতেও রাশেদার বিস্ময়ের ঘোর না কাটাতে তিনি আরও বলেন: তোমার আম্মাজান আছেন?

—স্ত্রী আছেন—কোনোমতে কথাগুলো উচ্চারণ করে এক বেয়ারাকে ডাক দিয়ে রাশেদা উধাও হয় শরমে মুখ রাঙিয়ে।

কিছু অপ্রস্তুত বোধ করলেও বেয়ারার মারফৎ খবর পাঠিয়ে অধ্যাপক সাহেব অচিরেই ফুপু আম্মার কাছে নীত হন। তাঁকে দেখে ফুপু আম্মা বেজায় খুশী। ঘরোয়া অনেক কথা জিজ্ঞেস করবার পর অতর্কিতে বলেন: আমার বড় মেয়ে রাশেদাকে চেন তো, তোমাদের কলেজেই তো পড়ে।

অধ্যাপক সাহেব নিজের মাথা নাড়াবার ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেন: রাশেদা যে তাঁর ছাত্রী তা তিনি অবগত আছেন।

ফুপু আম্মা রাশেদার অনেকক্ষণ গুণগান করে এবং সে গুণগানে ভাতিজার পূর্ণ সমর্থন পেয়ে সহসা জিন্নত মহলকে ডেকে তাকে বলেন: যা তো মা তোর আপাকে একবার ডেকে দে তো।

যাবার আগে জিন্নত মহল একবার ঘূর্ণায়িত দৃষ্টিতে অধ্যাপক সাহেবের দিকে তাকিয়ে যায়—সেই মাথা চিবাবার ভঙ্গীতে। নবীন অধ্যাপকও সেটা লক্ষ্য করেন যদিও ফুপু আম্মার সঙ্গে কথার স্রোত অব্যাহত রেখে। কিছুক্ষণ পরে জিন্নত মহল ফিরে এসে বলে: আপা এখন আলমারীতে কাপড় গুছাচ্ছেন, এখন আসতে পারবেন না। কথা শেষে আরেকবার নবীন অধ্যাপককে পর্যবেক্ষণ করতে ভুল হয় না জিন্নত মহলের। দৃষ্টির জবাব তিনিও দেন।

ফুপু আম্মা বলেন: এখানেই এসে থাকো না কেন, হোষ্টেলের থাকা বড় কষ্ট।

অধ্যাপক সাহেব সে প্রসঙ্গ কৌশলের সঙ্গে এড়িয়ে যান।

ফুপু আম্মা আবার বলেন: রোজ বিকেলে এসো এখানে, আমার মেয়েদের সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলতে পারবে।

অধ্যাপক সাহেব সে-কথার কোনো স্পষ্ট জবাব না দিয়ে সেদিনকার মতো বিদায় নেন। বাইরের বারান্দায় তখনও জিন্নত মহল ঘুরঘুর করছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে তীক্ষ্ণতর দৃষ্টির সংঘর্ষ।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান অধ্যাপক সাহেব—একতলার বাঁ দিকের কামরার পর্দার পেছনে রাশেদা কার যেন প্রতীক্ষারতা। নিমেষের জন্য মৃদু অন্ধকারে চার চোখ জ্বল জ্বল করে।

আসলে কাপড় গুছানোর কথা মিছে। নবীন অধ্যাপক সাহেব তার আত্মীয় হন, এ-কথা জানবার পর তাঁর সামনে আসতে দুনিয়ার শরম রাশেদাকে বাধা দিচ্ছিলো।

জিন্নত মহল উস্কানি দেয়ঃ যাও না আপা, ভদ্রলোক তোমার জন্যই এলেন আর তুমিই রইলে লুকিয়ে, ছাত্রীর এতো বেয়াদবি কি মাষ্টার সাহেবের সহ্য হবে।

ঈষৎ জ্বলে ওঠে রাশেদাঃ তোর এতো দরদ তো তুই যা না লক্ষ্মীছাড়ী।

—তা তো আমি বরাবর রাজী, তবে আমাকে কি ভদ্রলোকের মনে ধরবে, ভাইজানের মনে এতো দাগা দাও কেন আপা?

—দাগা দেওয়ার বেসাতি তো আমার নয়, জিনু। রাশেদার গলার স্বর কেমন যেন কোমল হয়ে আসে।

—এরই মধ্যে ডুবে ডুবে এতো জল খেয়েছো আপাজান। জিন্নতের কণ্ঠস্বর রহস্য চটুল। আচানক যেন ধরা পড়ে গিয়েছে এমন ভাব ফুটে ওঠে রাশেদার মুখেঃ তুই পোড়ারমুখী যা তা বলতে আরম্ভ করলি যে। যাবে কি না আপাজান তাই বলো।

—আমার হয়ে তুই যা না। বলে রাশেদা অন্যত্র চলে গিয়ে সিঁড়িতে অধ্যাপক সাহেবের পদধ্বনি শুনে পর্দার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো এমন ভঙ্গী করে যেন এ ঘনায়িত অন্ধকারে পর্দার অন্তরাল থেকে বাইরের কি আজব জিনিস দেখবার আছে।

কাদের এাদকে একদিন এক কাণ্ড করে বসলো। মদ খেয়ে বুদ হয়ে ছিলেন আব্বাজান; কি এক খুব দরকারী কাজে আম্মাজান দু' এক দিনের জন্য কোলকাতা গেছেন; স্কুল কলেজ খোলা থাকাতে দু'বোন

আব্বাজানের সঙ্গেই ছিলো। প্রচুর নেশা করে টলতে টলতে কাদের দু'বোনের কামরায় এসে হাজির হয় এবং তাদের বিছানায় ঢলে পড়ে, তখন রাত দশটা বেজেছে, একজনকে জড়িয়ে ধরে।

তারপরই হুলস্থুল এক কাণ্ড। দু'বোনের একসঙ্গে ত্রস্ত আর্তনাদ ; ঢলতে ঢলতে কামরা থেকে কাদেরের বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, হঠাৎ পাশের কামরা থেকে ছুটে আসা রওশন কাদেরের মাথায় দিলো হকি ষ্টিক-এর প্রকাণ্ড এক বাড়ি ; কাতরোক্তি করে নেশাগ্রস্ত কাদেরের মাটিতে পড়ে যাওয়া ; নীচে থেকে আব্বাজানের ভেসে আসা অস্পষ্ট গোঙানি ; দু'বোনের পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থরথরিয়ে কাঁপা। সে এক দেখবার জিনিস। দু'বোনের চোখে সে রাত্রে এক রত্তি ঘুম আসেনি ; কাদেরকে হাসপাতাল পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

পুরো তিনদিন রাশেদা নিজেকে এক কামরার ভেতর আটকা রেখেছিলো। জিন্নত, আব্বাজান বা কোলকাতা থেকে সব খবর শুনে হুড়মুড়িয়ে ফিরে-আসা আম্মাজান কারও অনুনয়ে সে ভোলে নি ; কারও কথায় কোনো কান দেয়নি। একবার মাত্র জিন্নতকে সে কামরায় কিছুক্ষণের জন্য ঢুকতে দিয়েছিলো। জিন্নত প্রবোধ দেওয়ার ভঙ্গীতে বলেছিলো ঃ শয়তানটা তোমাকে তো ছোয়নি আপাজান, তুমি এতো নিজেকে কষ্ট দিচ্ছো কেন ?

—ওর হাত আমার গায়েও এসে লেগেছিলো রে, অনেকটা সম্মোহিতের মতো রাশেদা বলে, আমার শরীর আর পাক থাকলো না। শেষের দিকে রাশেদার স্বর অনেকটা বিলাপধ্বনির মতো শোনায়।

—তোমার অজান্তিতে তোমার শরীরে একজনের হাত পড়েছে বলেই তুমি নিজেকে নাপাক মনে করছো আপা, তবে আমার কি দশা হবে, সে তো আমায় জড়িয়ে ধরেছিলো। যেন বিচ্ছু তাকে কামড়িয়েছে জিন্নত মহলের মুখাভিব্যক্তি দেখে মনে হয়—দুঃসহ যন্ত্রণার ছাপ সেখানে।

তবু রাশেদা প্রবোধ মানে না : বেঁচে থাকবার মতো আমার আর কিছু রইলো না জিমু, কি ভরসায় লোকের সামনে আমি মুখ বের করবো ?

—তোমার মন যদি পাক থাকে তবে ফুজুল লোকের বদ্ কথায় কান দেবে কেন তুমি, তারা কেউ তোমার মুখ দেখবার যোগ্য নয় আপা।

উত্তরে রাশেদা শুধু ডুকরে কেঁদে উঠেছিলো—যার চোখে জিন্নত মহল এপর্যন্ত এক ফোঁটাও আঁসু-দেখেনি।

সপ্তাহখানেক পরে যখন রাশেদা আবার কলেজে গেলো তখন বিরতির সময় অতর্কিতে তুমুল তুফানের প্রবল ঝাপ্‌টায় কলেজের পুরনো দালান এদিক-ওদিক নড়তে আরম্ভ করে দিলো যেন। অবিশ্রান্ত শিলাবৃষ্টি তার সঙ্গে। মনে হয় আসমান যেন পৃথিবীর দুষমন হয়েছে। রাশেদা ছিলো লাইব্রেরীর ঘরে। এমন সময় দরওয়ান এসে বললো নবীন অধ্যাপক সাহেব তাকে ডাকছেন।

চমকে ওঠে রাশেদা। তবে এমন দিনে শরম করলে চলবে না ; এগিয়ে যেতেই হবে। ডাক এসেছে আসমানের সীমানা ভেদ করে সে কোনো তাজ্জব-ভরা দেশ থেকে। দুরুদুরু বুকে সে এসে দাঁড়ায় পর্দার ফাঁক দিয়ে যাকে সে অবলোকন করেছিলো তাঁর কাছে।

ভাইজান বলেন : আজকে ব'লো ফুপুজানকে, আমি তোমাদের ওখানে যাবো।

যাদুতে যেন রাশেদাকে পেয়েছে এয়নি ভাব তার, মুখ থেকে বেরিয়ে এলো : আচ্ছা বলবো।

তারপরে কিছুক্ষণ চুপ করে রাশেদা দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে তখনও বিদ্যুতের খেলা ফুরোয়নি ; আসমানের সঙ্গে পৃথিবীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তেমনি অব্যাহত।

ভাইজান আবার বলেন : বিকেলে যদি ঝড় না থাকে তাহলে ব্যাডমিন্টনও খেলবো।

রাশেদা আর দাঁড়ায় না। শুধু সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে চলে যায়।

তারও বুকে তখন তুফান। তিনি কি সেদিনের ঘটনা জানেন ; জেনেও তার প্রতি বিরক্ত হননি। এ কি বিশ্বাস্য, খোদাতালাহ্ এমন কি হয় ?

আবার দেখা যায় কাদের ও জিন্নত মহলের মধ্যে ভাব আগেকার মতই জমে এসেছে। রাশেদা বুঝতে পারে না জিন্নত নিজেকে এত খেলো কেমনভাবে করতে পারে। বকে সে জিন্নতকে। জিন্নত মহল হেসে বলে : কাদের ছাড়া আমার আর গতি কি আপাজান, আমার পেছনে তো কেউ আর ধাওয়া করবে না।

তিরস্কারের ভঙ্গীতে রাশেদা বলে : তুই দিনের পর দিন কেমন হয়ে যাচ্ছিস জিন্নত, তোকে যে বেইজ্জত করলো তারই কাছে তুই আবার ভিড়লি ?

—আর লোক কই আপাজান ? ভঙ্গীতে রহস্যের ভাব আনবার চেষ্টা করলেও জিন্নত মহলের কণ্ঠস্বরে কিছুটা বেদনার আভাস ফুটে ওঠে।

যদি এক ভালো লোক দি ? রাশেদার প্রশ্ন।

—তিনি আবার কে ?

—কেন আমাদের নবীন অধ্যাপক সাহেব ? কিছুটা কাঁপনের ভাব কিছুতেই দমন করতে পারে না রাশেদা।

—তোমার তা সইবে কি আপা ? জিন্নত মহল বলে।

—আমার ভাবনা আমাকে নিজেই ভাবতে দে।

—না, তা হয় না আপা, আমার কাদেরই ভালো। জিন্নত মহলের কণ্ঠে নিশ্চয়তার আবির্ভাব হয়।

—তুই নিজেকে এমনভাবে নষ্ট করে দিবি আর আমি চুপ করে দেখবো ? রাশেদা শুধায়।

—আমার তো মনে হয় আপা নষ্ট না করে নিজেকে আমি ফুটিয়ে তুলছি।

রাশেদা সহসা নীরব হয়ে যায়।

অধ্যাপক সাহেবের তরফ থেকে পয়গাম এসেছে রাশেদার জন্য। কিছুদিন পরে আম্মা ও আব্বাজান উভয়েই রাশেদাকে ডেকে পাঠিয়ে তার মত জানতে চান। রাশেদা তো কেঁদে আকুল। যা-তা লোক তাকে শাদী করতে চাইবে আর সে নিমিষে রাজী হয়ে যাবে। তাকে বুঝানো হয় পাত্র হিসাবে অধ্যাপক সাহেব মোটামুটি ভালোই। রাশেদা কিন্তু কিছুতেই রাজী হয় না; পয়গাম প্রত্যাখ্যাত হয়। রাশেদা বরং আব্বা ও আম্মাজানকে উল্টো উপদেশ দেয়ঃ জিন্নত মহলের সংগে অধ্যাপক সাহেবের বিয়ের কথা চালান যেন তাঁরা।

তারপরই সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যা সকলকে চমকে দিলো, যা আব্বা আম্মাজানের দিল্ ভাঙলো, যা অধ্যাপক সাহেবকেও বিষম ভাবিয়ে তুললো।

কাদেরের সঙ্গে ঘর ছেড়ে রাশেদা তাকে বিয়ে করেছে—তুনিয়া যেদিন এ-কথা শুন্‌লো সেদিন তাক্ লেগে গেলো সকলের। জিন্নত মহলেরও। এত ভালো মেয়ে রাশেদা সে কি না শেষ পর্যন্ত···আজব জায়গা এ-তুনিয়া।

জিন্নত মহলকে রাশেদা এক চিঠি লিখেছিলো : আমার কথা ভাবিস নে, আমাদের মাষ্টার সাহেবকে তুই বিয়ে করিস, তুই খুশী হলে আমার কোনো তুঃখ থাকবে না, তোর তুলাভাই, লক্ষ্মী বোন, তোর যোগ্য নয়।

অধ্যাপক সাহেব জিন্নতকে বিয়ে করতে রাজী হন তবে নগদ দশ হাজার টাকার বিনিময়ে। টাকা দিতে আব্বাজান সম্মত ছিলেন, তবে জিন্নতই বেঁকে বসলো। তার আপার কথা ভুলে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে যে তার দেহ, কাদের দ্বারা ইতিমধ্যেই কলুষিত; কিনতে চায় তার মুখে ছাই!

পলাশ গাছে সাপ

শাদীর আড়াই বছর পরে।

গভীর একাগ্রতার সঙ্গে আসগর একটা কালো মলাটের মোটা ইংরেজী বই পড়ছিলো, এমন সময় জরিনা কোথা থেকে আচানক এসে বলে: বাচ্চার 'ফিড়িং বটেল' কিনে আনতে হবে, একটা কিনে এনে দিয়েন তো।

আসগর বই পড়াতেই মশগুল।

—শুনছেন, স্বরের মাত্রা একটু চড়িয়ে জরিনা আবার বলে, একটা নতুন 'ফিডিং বুটেল' কিনে আনতে হবে। 'এলেনবি'র হলেই ভালো হয়।

আসগর সহসা বলে ওঠে: কাণ্ডজ্ঞান বলে তোমার একটা কিছু নেই, দেখছো একটা দরকারী জিনিস পড়ছি, ঠিক এমন সময় তোমার ফিডিং বটেল কিনবার কথা না তুললেই নয়।

বাচ্চার দুধ খাওয়াটা বোধ হয় তেমন দরকারী না? মুখ অন্ধকার করে জরিনা জিজ্ঞেস করে।

তাই বলে তার একটা সময় অসময় নেই, বাচ্চা হওয়া তো একটা কম আপদ নয়—আসগরের রাগ মা থেকে ছেলের ওপর পড়ে।

আপনার বাপ হওয়া উচিত ছিলো না। জরিনা নিমেষে তেতে ওঠে।

—সেটা এখন আর মনে করিয়ে করবে কি, ছেলেটাও বাবা কম দজ্জাল হয়নি, খালি ফিডিং বটেল ভাঙ্গা, কেন নয়নের মণি আমার অন্ত

জিনিস ভাঙ্গতে পারো না। রাগে আবোল তাবোল কথা বলা আরম্ভ করে দেয় আসগর।

ফিডিং বটেল বুঝি বাচ্চা ভেঙ্গেছিলো? জরিনার প্রশ্ন করবার ধরন মারাত্মকভাবে শীতল।

তবে কে শুনি? আসগরের উদ্ধত ভাব কি আর অত সহজে থামে।

—বিছানা থেকে পা দিয়ে হটিয়ে কে ফেলেছিলো?

—বিছানায় জিনিসটা কে রেখেছিলো?

—হ্যাঁ, সবই আমার দোষ, সবই আমার দোষ, এমন লোক কি সুখে বিয়ে করতে গেছলো তা'ও বুঝি না।

—কেন বাচ্চাকে দেখেও সেকথা বুঝতে পারো না। আসগর রসিকতার ধরনে কথাটা বলবার চেষ্টা করলেও সে বিশেষ অবস্থায় জিনিসটার মানে দাঁড়ায় কিন্তু অন্য রকম।

—সেজন্যই যদি খালি বিয়ে করা হয়েছিলো তবে পাড়ায় গেলেই হোত। জরিনা রোরুদ্যমানা।

রোগের ভয়—আসগর তবু দমবে না।

ঝটকা দিয়ে সেখান থেকে জরিনা চলে যায়-ছেলের গলা জড়িয়ে কিছুক্ষণ কেঁদে মনের জ্বালা নিভাবার জন্য।

আসল ব্যাপার হয়েছে এইঃ ছেলের প্রতি গভীর মমতা বোধ করলেও বরের প্রতি টান জরিনার এখনও আগেকার মতোই প্রবল ও দুরন্ত। তবে, এবং সে কথা ভেবেই জরিনার মনে স্বস্তি নেই, স্বামীর তরফ থেকে কিন্তু আগেকার মতো সেরকম আর সাড়া পাওয়া যায় না। অথচ শাদীর প্রথম কয়েক মাস সে কি আশ্চর্য সুখে কেটেছে—এখন ভাবলে যা প্রায় স্বপ্নের মতো মনে হয়।

সে-সব বাসনা-ব্যাকুল ও উত্তপ্ত আবেগে কম্পমান দিনগুলি, জরিনা জানে, আর ফিরে আসবে না। তখন যাই কিছু দেখতো জরিনা, উষ্ণ বিস্ময়ে মন তার ভরে যেতো। তখনকার আকাশে বাতাসে মাঠে সদ্য

বাঁধন-ছেঁড়া যৌবন হেসে গেয়ে নেচে বেড়াতো। হাজার মাথা খুঁড়লেও সে মন আর ফিরে পাওয়া যাবে না—সে কথা ভেবে জরিনা মোটেই খুশী হতে পারে না। কারণ তার বড় সখ তার বর—সে নতুন না হলেও—এখনও তাকে নতুন দুল্‌হিনের মতোই আদর করুক ও ভালোবাসুক। এরি মধ্যে কি সে বুড়ী হয়ে গিয়েছে যে ফেলতাই মালের ভেতর তার স্থান! আগেকার মতো নিবিড়ভাবে আর আসগর তাকে চায় না কেন?

না হয় এর মধ্যে একটা ছেলেই হয়েছে, না হয় শরীর তার আগের তুলনায় একটু ভেঙ্গেই পড়েছে—তাই বলে এত নির্মম ঔদাসীন্য? আজকাল যখন ভালো করে সাজ করে সে আসগরের সামনে আবির্ভূতা হয় তার মুখ থেকে দু'একটা মিষ্টি কথা শুনবার জন্য, তখন নবাব সফরজঙ্গের মতো দীন দাসীর দিকে চেয়ে তিনি একটু মুচকি হাসি হাসেন। তাতেই বাঁদীর শরফরাজ হয়ে যাওয়া উচিত।

ওদিকে বন্ধুরা এলে ওর খুশী দেখে কে। তখন দুনিয়ার কথা মুখ থেকে বেরুবে। অথচ সে বেচারী যদি গল্প করতে যায় দু'একটা নেহাৎ দায়ে ঠেকার ধরনে কথা সেরে হয় কোনো বই চোখের সামনে খুলে বসে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার বাহানা, নতুবা সহসা একদম চুপ করে যায়—যেন আর দু'একটা কথা বললে তার হাঁপানী রোগ ধরে যাবে। তেমন অবস্থায় এমন কোনো মেয়ে আছে, হোক না বিবাহিতা, যার মেজাজ ভালো থাকবার কথা। কোমর বেঁধে বা মন খুলে যে তার সঙ্গে ঝগড়া করবে সে-পথও আসগর বন্ধ করে দিয়েছে। দোষ যে সবটা তারই নির্বিবাদে সে মেনে নেবে এবং তারপরে তেমনি নির্বিকার ভাবে বিছানায় গা এলিয়ে শূন্যে আঙ্গুল দিয়ে কি সব হাবিজাবি লেখা আরম্ভ করে দেবে। আর মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে জরিনা যদি মাঝে মাঝে একটু কাঁদে বেশ কিছুক্ষণ চুপটি করে সে বসে থাকবে আপনি থেকেই কান্না থেমে যায় কিনা বোধ হয়—সে প্রত্যাশায়—কি স্বার্থপর—তারপর যখন দেখে কান্না তাতে আরও বেড়েই চলেছে তখন আর কোনো ফন্দী খাটাতে

না পেরে তাকে কাছে টেনে নেয়, কিছুটা আদর করে, এবং সবচেয়ে বড় পুরস্কার যখন দেয় তখন হতভাগিনীর নসিবে এক চুমো পড়ে। তখন অবশ্য সে ঠাণ্ডা না হযে আর পারে না যদিও সে অনুভব করে আসগরের চুম্বনে সে উদগ্র আবেগ আর নেই, বা আগেকার সেই কম্পমান উষ্ণতা।

আর ছেলেকেও বাপ হয়ে যে একটু আদর করবে সে দিকেও সে নেই। খালি নিজের সুখ সুবিধার কথা, অপরের কিসে স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম তা যেন ভাবাও হারাম। এক এক সময় মন বড় বিষিয়ে ওঠে জরিনার। তাকে না ভালোবাসে না বাসুক কি যায় আসে তাতে। পুরুষের আবার ভালোবাসা! সে ভালোবাসার জন্য আবার এত হাঁসফাস করে মরা। তার চেয়ে বরং তার ছেলেকে নিয়েই সে থাকবে। কি টুকটুকে ফুটফুটে—জরিনা সহসা থুতু ফেলবার ভঙ্গী করে—ছেলে তার। ছেলের বাপের কথা মনে করবার ফুরসত তার কই?

মনে মনে এদিকে জরিনা সব সময় আশা করছিলোঃ তার রাগ ভাঙ্গাতে আসগর আসবে। কিন্তু আড়চোখে অতি সাবধানে স্বামীর দিকে চেয়ে সে দেখে, বাবু সাহেব দিব্বি পাখা খুলে বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে সেই কাল-মুখো বই পড়তে আবার আরম্ভ করে দিয়েছে।

সহসা জরিনার ইচ্ছে হয় পরিপূর্ণ ঘুমে অচেতন ছেলেকে চিমটি কেটে তুলে সে এক প্রবল কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। বই পড়বার মজা বুঝুন নবাব সাহেব। তবে মাসুম বাচ্চার দিকে চেয়ে জরিনার মন কেমন ঘুলিয়ে যায়। আহা আমার কলজের টুকরো রে. তোকে কি মা হয়ে আমি অমনভাবে চিমটি কাটতে পারি।

একদিন শনিবার বিকেলে অফিস থেকে ফিরে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে, আসগর জরিনাকে—যে কর্মক্লান্ত স্বামীর জুতোর ফিতে খুলতে এসেছিলো—বলেঃ কালকে বিকেলে আমার কয়েকজন বন্ধু চা খেতে আসবে—নাস্তার একটু জোগাড় করো তো

জুতোর ফিতে আল্গা করে জরিনা স্পষ্ট শুনিয়ে দেয়, সে আমি পারবো না।

—লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, স্ত্রীকে ফুসলাতে আরম্ভ করে দেয় আসগর, তুমি না পারলে কে আর পারবে বলো ?

—কেন, আপনার বন্ধুদের খাওয়াতে কি আমার দায় পড়ে, আপনি আমার কোনো কথা কি কখনও শোনেন ? জরিনা সুবিধে বুঝে প্রতি আক্রমণ চালায়।

—শুনতে কি আর ইচ্ছে করে না, তবে শোনা পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। আসলে জানো কি লোকটা আমি বড় অলস। আসগর নিমেষে নরম হয়ে যায়।

—আমারও তো আলস্য আসতে পারে। জরিনা পিছু হটবে না।

—তাহলেই সর্বনাশ, সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংসে যাবে, তোমরা সহযোগিতা না করলে কি আর পুরুষরা টিকতে পারে ? ঠাট্টা তামাশা করে আসগর নিজের কাজ হাসিল করবার মতলবে থাকে।

—আপনার সবটাতেই ঠাট্টা, ভালো লাগে না সব সময়। প্রায় ঝামটা দিয়ে ওঠে জরিনা। আসগরও সহসা গুম হয়ে যায়, শুধু বলে : নাস্তা না করতে পারলে না করলে, তোমার ওপর জোর তো আর নেই, বন্ধুদের না হয় বাইরের কোনো রেস্তোরাঁয় খাইয়ে দেবো।

—থাক এ বাঁদী যতদিন আছে রেস্তোরাঁয় আর খাওয়াতে হবে না, তবে খবরদার বলছি আর কখনও আমাকে আগে জিজ্ঞেস না করে বন্ধুদের চায়ের দাওয়াত করবেন না, র‍্যাশনের দিনে অত চিনি পাওয়া যাবে কোত্থেকে। জরিনা শেষ পর্যন্ত আর কঠোর থাকতে পারে না।

—তা বলেছো ঠিক—তুষ্ট করবার নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে দেখে আসগরের মুখে হাসি ফোটে।

সে দিনের সন্ধ্যা হঠাৎ অত্যন্ত বেহায়াভাবে বাসনা বিহ্বল হয়ে ওঠে। তার বদ খেয়ালকে শ্লথ আবরণ পরাতে গিয়ে আসমান বেচারা

শরমে বেজায় রেঙে যায়। জরিনার মন, চোখ তার পশ্চিম কোণে আটকে যাওয়ার পর, ঠিক বাসনা-বিভ্রান্ত নয়, বরং অতীত দিনের প্রায় লুপ্ত সোনালী স্মৃতিতে ভরে যায়।

বড় সখ হয় জরিনার আসগরের সঙ্গে বেড়াতে যেতে। বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে চাকরাণীর কাছে রেখে গেলেই হবে—কান্নাকাটি করলে তাকে কিভাবে ফুসলাতে হয় মেয়েটির জানা আছে। অতএব সেদিক থেকে বিশেষ কোনো অস্বস্তির কারণ থাকবে না। এখন অবশ্য আসগর রাজী হলেই হয়।

—একটা কথা বলবো, শুনবেন? বিছানায় এলিয়ে পড়ে থাকা স্বামীকে সে জিজ্ঞেস করে।

—কি কথা বলো? আলস্যে সমস্ত শরীর নিমজ্জিত করে আলগা ভঙ্গীতে আসগর উল্টো প্রশ্ন করে।

—আগে শুনবেন কিনা বলুন? জরিনার স্বরে প্রায় নেশা আসে।

—এই তো তোমাদের এক জ্বালাতন-করা অভ্যেস আগে থেকে কথা আদায় করে নিয়ে পরে এক অসম্ভব প্রস্তাব করে বসা। আসগরের কণ্ঠে বিরক্তির সূচনা।

মুহূর্তে জরিনার মুখ ভার হয়ে যায়। বলে : যাক্, আপনাকে আর জ্বালাতন করবো না। সব সময় তো জ্বালাতন করেই আপনাকে মারি।

এবার আসগর কিছুটা নরম হয় : কি কথা বলতে এসেছিলে বলো না কেন, একটুতেই মুখ ভার করে দোষটা আমার ঘাড়ে চাপানো কেন?

মুখ ভারও আমি করছিনে, সরবে এবং মুখ আরও ভার করে জরিনা প্রতিবাদ করে—আর কারও ঘাড়ে দোষও আমি চাপাচ্ছি নে।

বিছানা থেকে আচমকা উঠে জরিনার খুব কাছে এসে দাঁড়ায় আসগর : বলো না কি কথা বলতে এসেছিলে? তার কণ্ঠে প্রায় শিশুর অনুনয় ফুটে ওঠে।

—সবটাতেই আপনি ঠাট্টা করবেন না? জরিনার স্বর বিরক্তিগম্ভীর।

জরিনার শরীরকে বাহু দিয়ে বেষ্টন করে কোমল স্বরে আসগর বলে: ঠাট্টা করবো কেন, বলো না লক্ষ্মী কি বলতে এসেছিলে?

জরিনার মনের জ্বালা এরি মধ্যে অনেকটা জুড়িয়ে যায়, তবে এত সহজে আত্মসমর্পণ করা সঙ্গত হবে না মনে করে সে চুপ করেই থাকে।

—বলো না কেন? আবার আসগরের স্বর কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

—থাক্।

—থাকবে কেন, রাখবার মতো কথা হলে নিশ্চই রাখবো, বলো না? আসগর প্রায় জেদের ভঙ্গীতে বলে।

—না এমন কিছু না,—তারপর আসগরের মুখের ভাব লক্ষ্য করে—ভাবছিলাম বলবো যে বেড়াতে নিয়ে চলুন, অনেকদিন তো যাই নি।

—ও এই কথা, তাই নিয়ে এত হয়রান করে মারা, আমি ভাবছিলাম না জানি কি আশ্চর্য কথা বলবে। আসগরের স্বরে হতাশা উচ্চারিত।

—যাবেন তো? দীন ও কাতর অনুনয়ের ভঙ্গীতে জরিনা জিজ্ঞেস করে।

—না যাওয়ার কি আছে, চলো জলদি কাপড়-চোপড় পরে নাও। অপ্রত্যাশিত ঔদার্যের সঙ্গে আসগর জানান দেয়।

তাই, অনেক দিন পরে, মনের সুখে সাজ করতে থাকে জরিনা। নীলাম্বরী শাড়ী পরে লিকলিকে বিদ্যুতের মতো যার পাড়; শাড়ীর সঙ্গে মানিয়ে ব্লাউজ নির্বাচন করে; চোখে সুরমা লাগায়; মিহি ভুরুতে কাজলের এক সরু রেখা লাগায়; নীচের দিকে ঈষৎ ঝুলে পড়া ঠোঁটে কৌশলের সঙ্গে 'লিপষ্টিক'-এর ছোঁপ দিয়ে দেয়; সেন্ট মাখে; ব্লু রঙের 'লেডিজ কাবলি সেণ্ডেল' পায়ে লাগায়। গোসলখানা থেকে দাঁত মেজে ও মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে আসগর দেখে জরিনা নিজেকে এই অল্প সময়ের মধ্যে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে দৈনিক সংসারের সাধারণ গিন্নি থেকে রহস্যময়ী ও ইঙ্গিতা প্রেয়সীতে রূপান্তরিত করেছে।

মধুর ঠোঁটে ও মানানসই দেমাকে জরিনা যেন তার যৌবন নতুনভাবে জাহির করতে চায়। বুঝি এই ভেবে সে এখন উল্লসিত যে, এখনও ইচ্ছে করলে আসগরকে সে হাতের মুঠোর ভেতর রাখতে পারে। ঈষৎ ছল ও চাতুরী প্রয়োগ করলেই কোথায় থাকবে তার ঔদাসীন্য আর কোথায় যাবে তার নিস্পৃহ অবহেলার ভাব! যতক্ষণ নিজেকে বিনা দ্বিধায় বিকিয়ে দিচ্ছি ততক্ষণ আদর হবে না ; একটু যদি সরে দাঁড়াই দেখা যাবে তখন কি ফিকির তুমি বের করো। পুরুষের মন তো। জানা আছে, কিভাবে ভজাতে হয়।

তারা বেরুবে এমন সময় চাকরাণীর কোলে ছেলেটা এসে দাঁড়ায়। তাদের দেখে হেসে কুটিকুটি, যেন মা বাপের মনের কথা জানতে পেরে বড় আমোদ পেয়েছে সে।

—কুতভায় দাও, তারপর চাকরাণীর দিকে মুখ তুলে, নাম নাম।

ছেলেকে কোলে নিয়ে তার মুখে নিবিড় এক চুমো খেয়ে জরিনা মিনতি করে বলে : না এখন নামতে নেই সোনা, তোমার জন্য 'তকো' (চকলেট) আনতে যাই।

সে প্রলোভনে শিশু মন প্রবোধ মানে না, মায়ের কাছে এখন বিশেষ সুবিধে হবে না সে কথা বুঝতে পেরে সে এক অভিনব পন্থা বের করে : আব্‌বা দাই, নাম।

—চলো দেখি সিঁড়ি দিয়ে নামা আরম্ভ করি। জরিনার বিরক্ত মুখের ভাব লক্ষ্য করে আসগর সলাহ্ দেয়। সিঁড়ি দিয়ে কিন্তু যাহাতক তারা নামা আরম্ভ করেছে, ছেলেটার চীৎকারে আসমান প্রায় ধ্বংসে পড়বার উপক্রম।

—আমার আবার সখ করে বেড়াতে যাওয়া। জরিনার মুখ প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে যায়।

—তা চীৎকার করতে দাওনা ছেলেটাকে, তাই বলে আমাদের বেড়ানোটা মাটি হবে।

—হাঁ ছেলেটা এদিকে কেঁদে কেঁদে মরুক আর আমরা সখ করে বেড়াতে যাই, আচ্ছা বাপ হয়েছিলেন বটে আপনি। জরিনা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আরম্ভ করে দেয়।

নীরবে তার পেছনে আসগর উঠে আসে বিহ্বলিত মনে এই কথা ভেবে: বেড়াতে না যাওয়া যতটা দোষের বেড়াতে যাওয়া ততোধিক।

ছেলের কান্না থামাবার পর জরিনা এসে প্রস্তাব করে: বেড়াতে যাওয়া যখন মাটিই হলো, চলুন একটু ছাদে গিয়ে বসি।

—আকাশে কি চাঁদ উঠেছে? আসগরের অভিনব প্রশ্ন। সরলভাবে জরিনা জবাব দেয়: না চাঁদ ওঠে নি, তবে ফুরফুরে বাতাস দিয়েছে।

খুব সহজে আসগর রাজী হয়ে যায়: চলো।

ছাদ থেকে শহরের অনেকটা দেখা যায়। যে আকাশ কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যার বেহায়াপনা লক্ষ্য করে শরমে রাঙা ছিলো এখন তা কালো বোরখা পরেছে। চারিদিকের বাতিগুলো রাত্রির শহরের কৌতূহল ভরা চোখ বলে মনে হয়। জরিনার মনে কি ভাবনা বাসা বেঁধেছে শহরের চোখ তাও যেন খুঁজে বের করবে।

—আচ্ছা বলুন তো সাজবার পর আমাকে কেমন লাগছিলো? জরিনার চটুল প্রশ্ন।

—খুব ভালো, নিমেষে আসগর জবাব দেয়, প্রায় হেডী লামারের মতো।

—আপনার এ সর্বনেশে ঠাট্টার সঙ্গে পেরে ওঠা দায়, আপনি কি কখনও সত্যি কথা বলতে পারেন না। জরিনার কথা বলবার ঢঙে তার বহুদিনের সঞ্চিত হৃদয়ের ক্ষোভ প্রকাশ পায়।

ঈষৎ হেসে আসগর বলে: সব কথাকেই যদি তুমি ঠাট্টা হিসেবে নাও তাহলে আমি কি করতে পারি, আমি কিন্তু সত্যি কথাই বলেছিলাম।

—তা বলেছিলেন বটে, গভীর হতাশার স্বরে জরিনা বলে, চলুন এবার নীচে নামি।

—তা তুমি যদি নামতে চাও, নামো, আমি আর কিছুক্ষণ থাকি, বেশ হাওয়া দিয়েছে।

মুখ কালো করে, ‘াধারে অবশ্য তা আসগর দেখতে পেলো না, জরিনা একাকী নেমে যায়।

আবার একদিন বিকেলে, সপ্তাহ দুই যেতে না যেতেই, আসগরের বন্ধুরা চা খেতে আসে। ধকল সামলাতে হয় জরিনাকেই, তবে তাতে সে বিশেষ ক্ষুণ্ণ না এই কথা ভেবে যে মুখচোরা আসগরের বন্ধুর দল তেমন মুখচোরা নয়, এবং তাদের মজলিশী কথাবার্তা শুনতে জরিনার বেশ ভালো লাগে। আর বন্ধুরা এলে আসগরও বেশ খুশী থাকে। তার প্রতি আসগরের মনোভাব যাই হোক না কেন, সে কিসে খুশী হয় না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা স্ত্রী হিসেবে জরিনার কর্তব্য। গরম গরম সমুচা নিমকি আর এক রকমের মিষ্টি টেবিলে সাজিয়ে রেখে মুখ ধোয়ার মানসে গোসলখানায় যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে কিছুটা সাজগোজ করে টেবিলে ফিরে এসে দেখে বন্ধুর দল সকলেই এসে উপস্থিত এবং তারই অপেক্ষা করছিলো। সে চেয়ারে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা পিঁপড়ের দল যেমনভাবে খাওয়া গ্রাস করে তেমনিভাবে টেবিলে সাজানো জিনিসগুলো আক্রমণ করা আরম্ভ করে দিলো।

বন্ধুদের মধ্যে একজন অবিবাহিত, সে বলে: বেশ মুচমুচে নবনীত হয়েছে জিনিসগুলো, এমন খাস্তা সিঙ্গারা আর কোথাও খাই নি।

—কেন নিমকিটা কি কম মুচমুচে হয়েছে, আসগর হাসির সঙ্গে যোগ করে, ঘরে এমন গিন্নী থাকলে এক রেস্তোরাঁ খোলা যায়।

আসগরের কথা শুনে মনে মনে জ্বলতে থাকে জরিনা। সময় নেই অসময় নেই সবটাতেই ঠাট্টা। অবিবাহিত বন্ধুটি আবার বলে: এ রকম গিন্নী পাবো বলে যদি কেউ আশ্বাস দেয়, নিজের কুমারিত্ব এখুনি ঘুচিয়ে ফেলি।

তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আমোদিত স্বরে জরিনা বলে: আপনার, ব্যাটা ছেলের আবার কুমারিত্ব কি?

—সে তুমি বুঝবে না। আসগর ফোড়ন কাটে এবং বন্ধুর দল সমবেতভাবে হেসে ওঠে। জরিনা বড় অপদস্থ বোধ করে। আসগরের প্রতি রাগ তার আরও বাড়ে। বন্ধুদের সামনে বউকে খাটো করবে না তো আর কোথায় করবে।

হঠাৎ জরিনার মাথায় এক ভাবতরঙ্গ খেলে যায়। সে লক্ষ্য করেছে, বন্ধুর দল তার মাধুর্য সম্বন্ধে আসগরের মতো অতটা উদাসীন নয়। বিশেষ করে যার শাদী হয় নি, সে তো বলতে গেলে তার বেশ অনুরক্তই। অতএব তার দিকেই নজর দেওয়া যাক না একটু বেশী। প্রতিক্রিয়াটা কি হয় দেখা যাক্।

আপনার কিন্তু এখন শাদী করা উচিত। কৌশলে উদ্ভাবিত আক্রমণ পন্থা আচানক প্রয়োগ করে জরিনা।

—একটা ভালো দেখে মেয়ে জুটিয়ে দেন না কেন ? বন্ধুর আগ্রহের অভাব নেই।

—আমাদের বাছা মেয়ে কি আপনাদের মতো লোকের পছন্দ হবে। জরিনা একটু রঙ্গচ্ছলে বলে।

আপনাকে যখন বন্ধুর পছন্দ হয়েছে, আসগরের দিকে ত্বরিত দৃষ্টিতে চেয়ে তার অবিবাহিত বন্ধু বলে, আপনার পছন্দ করা মেয়ে তখন আমরাও তো মনে ধরবার কথা।

—এত তাড়াতাড়ি বিয়ে কোরেন না, পরিহাস ছেড়ে এবার জরিনা গভীরতর কথায় আসে, পরে আফসোস করবেন।

এতক্ষণে আসগর ফোড়ন কাটে : নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলা নাকি।

আসগরকে সামান্যতম ঈর্ষান্বিত করবার চেষ্টা বিফলে যেতে দেখে জরিনা নিজেকে সম্বরণ করে নেয়, স্বামীর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানকেও সে উপেক্ষা করে।

জরিনার প্রতি আসগরের আচরণে কোনো রকম উত্তাপ এখন নেই। তার বন্ধুদের মধ্যে কারও প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দিলেও আসগরের

ভাবান্তর হয় না—যেন জরিনা কি করে আর কি না করে তা নিয়ে মাথা ঘামানো আসগরের পক্ষে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়।

অথচ সময় এমন ছিলো, খুব বেশীদিনের কথাও নয়, যখন জরিনা সেজে-গুজে রাস্তায় বেরুলে আসগর তার পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে আশ্চর্য-ভাবে সচেতন হয়ে উঠতো। কে তার দিকে তাকাচ্ছে, তাকে দেখে কে কি মন্তব্য করলো, খুব সতর্কতার সঙ্গে আসগর সেগুলো লক্ষ্য করতো। জরিনার যৌবনকে অন্ততঃ আসগর তখন সমাদর না করলেও স্বীকার করতো। আর এখন···সে কি নিস্পৃহ ভাব, পাগল করা ঔদাসীন্য।

আসগরের বন্ধুরা সকলে তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বুঝতে পেরে কোনো এক ছুতো করে জরিনা টেবিল থেকে উঠে আসে। বন্ধুদের সঙ্গে নতুন উৎসাহে আসগর গল্প জুড়ে দেয়। আর ভিতরের কামরায় বাচ্চাকে কোলে নিয়ে, জরিনার মধ্যে যে অবহেলিতা নারী তা মাতৃত্বের আস্বাদনে প্রবোধ খোঁজে।

পাঁচ ছয় দিনের জন্য আসগরের অফিস ছুটি। বাপের বাড়ী বহুদিন জরিনা যায়নি, আসগরের কাছে প্রস্তাব করাতে শ্বশুর বাড়ী যেতে সে সহজেই রাজী হয়ে গেলো। বেজায় খুশী হয় জরিনা এবং খুশীর আতি-শয্যে এমন কি বেচারী স্বামীকে একটা চুমো উপহার দেয়। লোক একে-বারে খারাপ নয় আসগর। ভাবভঙ্গী মাঝে মাঝে তার বিচিত্র বটে, তবে তার মনে জরিনার প্রতি এখনও কিছুটা ভালোবাসা নিশ্চয়ই আছে। পুরুষ মানুষের সব কিছু নারীর চাওয়া মাফিক হবে এতটা প্রত্যাশা করা অন্যায়। তার নিজের মনটাই বোধ হয় একটু বেশী খুঁতখুঁতে হয়ে গেছে। সব কিছুরই বাঁকা মানে করে।

তবে চুম্বনোপহারের প্রতিক্রিয়া হয় অপ্রত্যাশিত। আসগর ঈষৎ বিকৃত ধরনে হেসে বলে : বাপের বাড়ীর দিকেই বোধ হয় মন তোমার সব সময় উধাও হয়ে থাকে, একটু হাওয়া বইলেই স্বামীর বাড়ীর কথা বেবাক ভুলে যাও।

আসগরের মন্তব্যের গোটা মানে না করতে পারলেও জরিনা এটুকু বুঝতে পারে তার চুম্বনের যথার্থ প্রতিদান সেটা নয়। সহসা আসগরের প্রতি তার গভীর বিদ্বেষ জাগে : এমন চূড়ান্তভাবে স্বার্থপর ও হীনমনা জীব জরিনা তার এ উনিশ বছরের জীবনে আর দেখে নি।

—ওখানে না যেতে চান যেয়েন না। আপনার ওপর তো কারও জোর নেই। মুখ অন্ধকার করে জরিনা শুধু বলে।

তা যাবো না কেন, শ্বশুর বাড়ী মধুর হাড়ি……আসগরের হঠাৎ থেমে যাওয়াটা বেশ সঙ্কেতপুর্ণ। জরিনা আর কোনো উচ্চবাচ্য করে না।

সারা পথটা এবং ট্রেনে চড়বার পরও বেশ কিছুক্ষণ একদম কোনো কথা হয় না। আসগরের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা না বলে থাকা জরিনার পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আসগর তাকে রাগালেও তাকেই, এমনি তার কপাল, উল্টো আসগরের রাগ ভাঙাতে হয়। তবে এত সহজে এবার সে মচকাবে না। কাগজ পড়ায় সাহেব মন দিয়েছেন। পাশে যে বউ ও ছেলে বসে আছে সে খেয়াল নওয়াব বাহাদুরের নেই। মস্‌ত্‌ হয়ে কাগজের প্রতিটি লাইন্ সে গিলছে যেন। কাগজটার ওপর সহসা বিজাতীয় রাগ হয় জরিনার। ইচ্ছে করে আসগরের হাত থেকে জোর করে কাগজটা কেড়ে নিয়ে তা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে বাতাসে লেলিয়ে দেয়। অথচ আসগরকে সে যদি এখন শুধু কাগজ পড়া বন্ধ করতে বলে, মারমুখো হয়ে বোধ হয় সকলের সামনেই সে তেড়ে আসবে। কাগজ তো নয়, যেন সতীন।

গরম পড়েছে বেজায়। পাখার হাওয়াতে বাতাস আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পসিহ্‌নাতে ভেতরটা একদম ফল্গু নদী হয়ে গেলো। ছেলেটাও সুযোগ বুঝে তিড়িং বিড়িং আরম্ভ করে দিয়েছে। মনের অবস্থা জরিনার মোটেই সুবিধের নয়।

হঠাৎ কখন জানি ছেলেটা খোলা জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তখুনি হাত ধরে অবশ্যি জরিনা তাকে বসিয়ে দিলো। তবে তার আগেই

ছেলের দুরন্তপনা ও মায়ের গাফিলতি খবরের কাগজ পড়তে থাকা আসগর লক্ষ্য করেছে। কণ্ঠে বিষের তীব্রতা এনে অপ্রত্যাশিত কাঠিন্যের সঙ্গে বলে—ছেলেটা জানালা থেকে পড়ে যখন মরবে তখন মায়ের দিল বোধ হয় তোমার খুশী হবে।

শিউরে ওঠে জরিনা। ওমা, কি লোক এই আসগর! বাপ হয়ে ছেলের দুর্ঘটনায় পড়ে মরবার কথা এত সহজে বলতে পারে। মরতে যদি হয় কাউকে তো আসগরই মরুক। সে-ক্ষতির ধাক্কা পৃথিবী সহজেই সামলে নিতে পারবে। তার এই মাসুম বাচ্চার, হে খোদাতালাহ্, যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

বাপের বাড়ী পৌঁছে মনের সুখে জরিনা কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করে। মা বাবার কাছে সে এখনও সেই ছোটো মেয়েটিই আছে; মা হওয়ার দরুণ খাতির আরও বেড়েছে যদিও। এখানে সে কারও ভারিক্কী ধরনের বউ নয়; অবাধ স্বাধীনতা তার।

আম্মা ও আব্বাজানের সঙ্গে গল্প করতে করতেই বিকেলটা সন্ধ্যেয় গড়িয়ে যায়। কিছুক্ষণ ধরে ধুলো ওড়ানো, ধীরে ধীরে বাড়ন্ত বাতাসের সঙ্গে আকাশের ঈশান কোণে মেঘও জমছিলো। বাথরুম থেকে যখন জরিনা গোসল করে বেরিয়ে এলো তখন আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের দ্রুত সঞ্চরণ। সাজ করতে করতেই আসমান ক্ষণে ক্ষণে হতে থাকে অগ্নিবরণ! কপালে যখন টিপ দেওয়া তার শেষ হয়েছে তখন লেলিহান আগুন-শিখার ক্ষিপ্ত বিস্ফোটনে ধরিত্রী ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে।

সব দেখে জরিনার মন কিন্তু গান গেয়ে ওঠে। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; চোখের সামনে বাজ পড়ছে; আকাশ এত ভীষণ কালো যে মনে হয় সেখানে মানবাত্মার সমাধি। কেয়ামৎ এলো নাকি? আসে যদি আসুক! সে ভয়ে কি জরিনার হৃদয় কাঁপে! যৌবন তার উথলে উঠেছে; মনের বন্য বাসনা বিদ্যুৎ ও বাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত; যাবে সে এখন দুর্লভ অভিসারে তার প্রিয়তমের কাছে।

নীচে আসগরের খোঁজে জরিনা এসে দেখে কামরার এক কোণে চেয়ার টেনে নিয়ে চুপটি করে বসে আছে সে। ভয়ে মুষড়ে গেছে। জরিনাকে দেখে তার দিকে অনেকটা বিহ্বলের মতো চেয়ে থাকে আসগর —যেন এ মহা-দুর্দিনে সে ছাড়া আর তার কোনো সম্বল নেই।

আচানক ভারী মায়া হয় স্বামীর প্রতি জরিনার। বিকেলের সমস্ত জ্বালা নিমেষে দূর হয়ে যায়। আহা বেচারা! ভয়ে কেমন জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে অনেকটা অবোধ শিশুর মতো। চোখে কি দীন আবেদন।

হঠাৎ জরিনা নতজানু হয়ে বসে আসগরের মুখটি নিজের বুকে দুরন্ত আবেগে চেপে ধরে। সামনের দরজার কাঁচের শার্সিতে বিদ্যুতের নিরন্তর কশাঘাত ছাড়িয়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টি পড়ে তার ঃ তারের বেড়ার পাশে ও আকাশের দিকে বিচিত্র ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তাকানো পলাশ গাছের ওপর। নিবিড় কালো আসমানকে গভীর ঠোঁটে মুখ ভেঙচিয়ে পলাশ গাছের ফুলগুলি বিজলীর রওশনীতে নিজেদের মুড়ে দিচ্ছে। চারপাশের উন্মত্ত কলরোলে পলাশ গাছ শুধু ফিনকি দিয়ে হাসছে আর দরাজ দিলে ছড়িয়ে দিচ্ছে ভরাট যৌবনের অকুণ্ঠিত সুষমা। আসগরের কানের কাছে মুখ এনে গভীর মিনতির স্বরে ফিস্‌ফিস্‌ করে জরিনা বলে ঃ আমি তোমায় এমনভাবে চাই গো, আর তুমি আমায় একটুও ভালো-বাসতে পারো না!

জবাবে আসগর শুধু বলে ঃ আমায় একটু ছাড়ান দাও, নিশ্বেস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

পলাশ গাছের শীর্ষকে আলোকিত করে আবার বিজলী ঝলকে ওঠে ঃ আর আসগরের কাঁধ থেকে জরিনার হাত খসে যায়। বিদ্যুতের ঝলকে পলাশ গাছের ফুলের ভেতর সে যেন সাপ দেখেছে।

ছেদ

আর পারা যায় না ! নঈমা নিত্য গঞ্জনা দেয় ঃ নিজের বউ ছেলেকে খাওয়াবার মুরোদ নেই, মরদ হয়ে জন্মেছিলে কেন ?

মরদ হয়ে জন্মালেই যে সব সময় বউ ছেলেকে খাওয়াবার মুরোদ হয় এই ধারণা নঈমা কোথা থেকে পেলো সে-ই শুধু জানে। তবে কেরাণীর চাকুরী করে নজমুল যে বউ ছেলেকে যথেষ্ঠ পরিমাণে খাওয়াতে পারে না এটা ঠিক।

দশ বছর হলো তাদের বিয়ে হয়েছে—ছেলে মেয়ে হয়েছে চারিটি। প্রথম ছেলেটা নঈমার বাপের বাড়ীতে হয়েছিলো। ছেলে হওয়ার সব-কিছু খরচ তাঁরাই করেছিলেন। পরের তিনটির জন্য সেখান থেকে তেমন সাড়া না পাওয়ার দরুণ দাইয়েরই শরণাপন্ন হতে হয়েছিলো। শেষের তিনবারের কোনোবারই নঈমা একসঙ্গে দশ-বারো দিনের বেশী বিছানায় থাকতে পারে নি। দরকার হলেও সংসারের ঝামেলা তা হতে দেয় নি।

অথচ, এখানেই খোদার রহমতের আভাস, নঈমার শরীরটা এখনও অটুট। এমন কি, কোথাও একটু ভাঁজ পড়েনি। কি করে কম খেয়ে নিত্য অভাবের সঙ্গে যুঝে নঈমা তার শরীরটা এখনও ঠিক রেখেছে নজমুল তা বুঝতে পারে না।

অবশ্য নঈমার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পড়ে—মাঝে মাঝে বিস্কুট লজেন্স নিয়ে আসে। সেগুলি তো বাচ্চারাই খায়। আর নঈমাও যদি চুপি চুপি সেগুলোতে ভাগ বসিয়ে থাকে, তবে শুধু তাতেই তো তার দেহে এত পুষ্টি আসবার কথা নয়।

নিজের দেহ সম্বন্ধে, এই এত অভাবের সংসারের মধ্যে, নঈমা বেশ সচেতন। বাজার খরচা থাকুক বা না থাকুক তার নারকেল তেল চাই-ই। নঈমাকে মাথার চুল শুকনো রাখতে নজমুল খুব কম দেখেছে।

একবার সপ্তাহ খানেক এর ব্যতিক্রম হয়েছিলো। সেবার বড় ছেলে খালেদ, বয়স যখন তার বছর চারেক হবে, শীতে প্রায় সারাদিন শুধু একটা ছেঁড়া গেঞ্জী পরে থাকবার দরুণ, কঠিন অসুখে পড়েছিলো।

প্রথম তারা চালিয়েছিলো হোমিওপ্যাথি—পয়সা কম লাগে বলে। তবে রোগের যখন তাতে কোনো উপশম হলো না তখন বাধ্য হয়ে এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার তারা আনিয়েছিলো, বহু কষ্টে ধার জোগাড় করে।

ডাক্তার বললো নিউমোনিয়া। তবে সময় মতো ধরা পড়াতে ভয়ের কিছু নেই।

সেবার একসঙ্গে সাতদিন নঈমা মাথায় তেল দেবার কথা ভাবতে পারে নি। উদভ্রান্তের মতো ছেলের সেবা করেছিলো। চুলে তখন তার বেশ জট ধরেছিলো বটে, তবে সেবার তা মা হিসেবে তাকে দেখতে নজমুলের চোখে আরও যেন ভালো লেগেছিলো।

এক রাত্রে খালেদের অবস্থা খুব খারাপের দিকে গিয়েছিলো। ডাক্তার আবার ডাকা হলো, ইন্‌জেকশন দেওয়া হলো, ওষুধ আনা হলো। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই প্রায় সারারাত জেগে অসুস্থ ছেলের সমস্ত খুটিনাটি প্রয়োজনের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলো।

নঈমা তাকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নিতে বলেছিলো—সারারাত জেগে থেকে নজমুলের শরীর যদি আবার ভেঙে পড়ে তবে আর এক মুসিবত।

—ঘুমোনো তোমারই বেশী দরকার! নইলে একা মানুষ এত ঝামেলা পোহাবে কি করে? স্বামীর কথা শুনে নঈমা হঠাৎ রেগে উঠেছিলো: নিজের ছেলের সেবা করা ঝামেলা নাকি?

—তাই বললাম বুঝি, সংসারের কাজও তো আছে!

জবাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে নঈমা হঠাৎ স্বামীর খুব কাছে সরে এসে ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে কিছুটা কম্পিত স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলো : ছেলে আমার বাঁচবে তো!

স্ত্রীকে বাঁ হাতে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করে নজমুল গভীর আশ্বাসের স্বরে অভয় দিয়েছিলো : আরে বাঁচবে না কেন, আজকাল নিউমোনিয়াতে লোক কি আর সহজে মরে ? কত ভালো ওষুধ বেরিয়েছে !

ছেলে ভালো হয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সে নৈকট্যবোধ আর বেশীদিন থাকে নি। আবার সেই দিনের পর দিন অভাব। ছোটো মেয়েটা একেবারে দুধ পায় না ; মেজ ছেলের কামিজটা এত জায়গায় ছিঁড়েছে যে আর তালি দিয়েও পরাবার উপায় নেই। নঈমার নিজের পরনের শাড়ী দুটোয় এসে দাঁড়িয়েছে—তার একটা আবার ছিঁড়িছিঁড়ি করছে।

অবিরত অভাবের এই ফিরিস্তি শুনে নজমুল এক একবার খেপে উঠতো : পয়সা কি আমায় চুরি করতে বলো ?

—তা আমি কি জানি, নঈমা উল্টো ঝেঁঝে উঠতো, তবে পয়সা কামাই করা তো আর মেয়েদের কাজ নয়।

—না-ই বা কেন ? শুধু পুরুষের ওপরই সমস্ত ঝক্কি পড়বে কেন, তুমি কিছু আয় করতে পারো না ? শেষের দিকে নিজের অজান্তেই নজমুলের গলার আওয়াজ একটু বেঁকে গিয়েছিলো।

—কিভাবে আয় করবো ! পথ বাৎলে দাও না।

—কেন সেলাই-টেলাই তো করতে পারো।

—ওরে আমার মরদ রে, সেলাইয়ের দশটা কল যেন আমায় কিনে দিয়েছে। শরম হয় না নিজের দোষ অন্যের কাঁধে চাপাতে ?

তার ভেতরটা তেতো হয়ে উঠলেও এর কোনো জবাব নজমুল দিতে পারতো না—তাই চুপ করে যেতো। তবে এই যে চুপ করে যেতে হয় এটাভেই সব চেয়ে বেশী দাহন। মরদ হয়ে জন্মালেও সত্যি তার মুরোদ নেই।

একদিন দূরাত্মীয়টা এসে প্রস্তাব করে : চলুন দুলাভাই, আপাকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখে আসি। 'মহল' ছবিটা নাকি বেশ ভালো হয়েছে।

সিনেমা দেখবার সখ থাকলেও সে নিজে গেলে সমস্ত খরচা বাধ্য হয়ে তাকেই দিতে হবে এ-কথা মনে হওয়াতে নজমুল কথাটা একটু কৌশলের সঙ্গে ঘুরিয়ে নেয় : না ভাই, সিনেমা দেখা কি আমাদের পোষায়, তোমার আপা যেতে চাইলে তাকে নিয়ে যাও।

আর, নজমুল কিছুটা আহত হয়ে লক্ষ্য করে, নঈমাও সহজে রাজী হয়ে যায়। কিছুটা সেজে গুজে ক্যাম্বিশের জুতো পরে রিক্সায় চড়ে দু'জনে সিনেমা দেখতে বেরিয়ে গেল—বাচ্চাদের তদারকের ভার নজমুলের ওপর ছেড়ে দিয়ে।

রাত নয়টায় সিনেমা থেকে ফিরে এলে নঈমাকে নজমুল বললো : এ-ভাবে যে সিনেমা যাও লোকে জানতে পারলে কি বলবে।

মধুর সরলতার সঙ্গে নঈমা জবাব দিলো : ভাইয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবো তাতে দোষের কি আছে? তোমার দেখছি মনটা বড় ছোটো। তারপর স্বামীকে কিছুটা প্রবোধ দেওয়ার ভঙ্গীতে বললো, সত্যি 'মহল'-এ মধুবালাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে।

তাতেও নজমুল ঠিক প্রবোধ মানে না। ভাবে : সে যখন নঈমাকে ছেড়ে সিনেমা দেখে না, বন্ধুরা দেখাতে চাইলেও, তখন নঈমা তাকে ছেড়ে সিনেমা দেখতে গেল কি করে। তাও পরপুরুষের সঙ্গে।

ভোরে উঠে নজমুল দেখে মেজ ছেলে বিছানা ভিজিয়েছে। ভোরের যে হাওয়া [illegible] কিছুটা সতেজ করতে পারতো প্রস্রাবের [illegible]টু গন্ধ তার সাথে মিশে নজমুলের মেজাজটাকে বিগড়ে দিলো। এ রকম প্রায় [illegible]ই হয়। তবে গত রাতের কথা ভেবে নজমুলের মনটা আর সব দিনের [illegible] একটু বেশী খিচিয়ে থাকে।

চি[illegible] আর এক কাপ কম দুধের, কম চিনির, ধোঁয়ায় বিস্বাদ চা

খেয়ে, ভাঙা পাকঘর থেকে এখনও অবিরত-আসা ধোঁয়া পান করে নজমুল নিজের সংসারের দিকে একবার চেয়ে দেখে।

দু'ছেলেই উদম হয়ে ঘুরছে, বড় মেয়েটির পরনে একটা ছেঁড়া জাঙ্গিয়া। ভিজে কাঁথা শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বেলা ন'টার রোদ কাঁথার আর্দ্রতা সদ্য শুষতে আরম্ভ করেছে বলেই গন্ধটা তার এখন আরও কটু। ভিজে পুরনো নোংরা কাঁথার কাপড় এখন রোঁয়া রোঁয়া হয়ে গেছে।

এই তাহলে তার মাসে তিরিশ দিনের কাহিনী।

ওদিকে নঈমা আবার তাড়া দিচ্ছে : খুব যে রোদ পোহাতে বসলে, বাজার করতে যেতে হবে না? ওদিকে অফিসে খেয়ে না যেতে পারলে তো আমার চৌদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করবে।

মিথ্যে মিথ্যে গঞ্জনা, অভাবের দৈনন্দিন নিষ্করুণ পীড়ন, দিনে দিনে একটু একটু করে ক্ষয়ে যাওয়া। না, এ আর চলবে না। যেমন করেই হোক এ জীবন বদলাতে হবে। পরে যা ঘটুক, কুছ পরওয়া নেই। মুহূর্তে নজমুল নিজের মন ঠিক করে ফেলে।

ম্যাজিষ্ট্রেট অফিসের কেরাণী বলে সুবিধে অনেক। প্রথম যেদিন সে দু'টাকা ঘুষ নেয় নিজের কাছে নিজেকে ছোটো মনে হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো, যে হাতে টাকাটা নিলো তাতে কয়েকটা আধা-লাল আধা-কালো কেঁচো ঢুকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরে তাদের পিচ্ছিল দেহ থেকে একটু একটু করে রস নিঃসরণ করে সমস্ত হাতটাকে দুর্গন্ধে ভরে দিয়েছে।

কিন্তু অফিস থেকে ফেরবার সময় বাবুবাজারের কাছ থেকে নঈমার জন্য কিছু বেলফুল নিতে ভোলেনি।

নঈমা তাজ্জব হয়ে গেছলো। কবে যে এর আগে নজমুল তার জন্য ফুল এনেছিলো নঈমা সে কথা এখন আর মনে করতে পারে না। তবে তা নিয়ে এখন নজমুলকে গঞ্জনা দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। স্বামীকে

নিয়ে এখনও নঈমার মনে কিছুটা সাধ আছে। নিজের অটুট দেহসুষমা সম্বন্ধে সে সংসারের হাজার দীনতার মধ্যেও সচেতন না হয়ে পারে না। স্বামীর তরফ থেকে আজকাল তেমন সাড়া পাওয়া যায় না বলেই ইউ-নিভার্সিটিতে পড়া সেই ছোকরা আত্মীয়ের ওপর নঈমা সেটা পরখ করে মনে মনে খুশী হতো।

অথচ পরপুরুষকে নিয়ে অসতীত্বের কোনো চিন্তা তার মধ্যে নেই। শুধু নজমুল যদি তাকে মাঝে মাঝে কাছে ডাকতো, কিছুটা আদর করতো, কখনও কখনও চুলের ফিতা বা অন্য কোনো চুটকি উপহার এনে দিতো, তবে তার নিজের মেজাজ খিটখিটে কখনও হতো না।

আজকে রাতে শুধু কয়েকটা বেলফুল—বড় জোর সব মিলে দুআনা দাম হবে—নঈমা নিজের চুলে বেধেছে। তাতেই মনে কি অঘটন ঘটে যাচ্ছে।

বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা কামরাটা ফুলের গন্ধে ভরে গেছে জানালার ফাঁক দিয়ে, অনেক দিন পরে কামনা-কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে নঈমা কয়েকটা গিনির মতো উজ্জল তারা দেখতে পায়। মনটা তাতে এমন ভরে যায়। সাধ হয়, নজমুলকে নিয়ে আসমানের অঙ্গনে তারা দু'জনে ঘুরে আসে, তারার ছোঁওয়া নিজেদের মধ্যে নিয়ে!

ওদিকে নজমুলও খুশী হয় অনেকদিন পরে নঈমাকে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়ে। রাতের গোপনতায় বেলফুল কতটা মাদকতা সৃষ্টি করতে পারে সেটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার ঘুষ নেবার কথা মনে পড়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে সেই কেঁচোর ছবি।

নঈমা লক্ষ্য করে সংসারের ছোটোখাটো অভাব এক এক করে সব দূর হয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের সার্ট-প্যাণ্ট এলো, মেয়েদের ফ্রক। নজমুলের একটা নতুন ঠাণ্ডা 'স্যুট,' তার নিজের তিন চারটে শাড়ী।

তাতে নঈমা কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচলেও কৌতূহলও তার মধ্যে

চাড়া দিয়ে ওঠে। একদিন নজমুলকে জিজ্ঞেস করেই বসে : আজকাল এত পয়সা আসে কোত্থেকে ?

—আমরাও দরকার হলে কিছু পয়সা আয় করতে পারি গো। নজমুল অনেকটা দুর্বল কণ্ঠে বলে।

—আয়টা কি ভাবে হয় তাই বলো না কেন। নঈমা আরও পরিষ্কার জবাব চায়।

—টুইশানি করি আর 'গেট-এ-ওয়ার্ড'-এ মাঝে মাঝে টাকা পাই। নজমুলের নিজের কানেই নিজের কথা বড় ফাঁকা শোনায়।

সংসারে সদ্য-আসা সচ্ছলতা লক্ষ্য করে বড় ছেলে মায়ের উপস্থিতিতে একদিন বাপের কাছে এসে দাঁড়ায়। পাড়ায় তারা একটি ক্রিকেট টিম করেছে। তবে 'ব্যাট' এ পর্যন্ত জোগাড় হয় নি। তার খেলার সাথীরা তাকে ধরেছে বাপকে বলে একটা ক্রিকেট ব্যাট-এর টাকা জোগাড় করতে পারে কি না। প্রথমে মাকে বলেছিলো। নঈমা জবাব দিয়েছিলো : তোর বাপকে বলতে পারিস না ?

তাই সাহস করে ছেলে বাপের কাছে এসে প্রত্যাশার ভঙ্গীতে দাঁড়ায় কিন্তু আসল কথাটা মুখ ফুটে আর বলতে পারে না।

নজমুল ছেলেকে অভয় দেয় : কি, তোমার মতলব কি ?

ছেলের দ্বিধা দেখে মা সে কথাটি জানিয়ে দেয়।

নিজের ছেলের প্রতি নজমুল সহসা গভীর মমতা বোধ করে। বড় সুবোধ, নম্র তার এই ছেলে। কখনও তেমন কিছু আবদার করে না। আজ শুধু ক্রিকেট ব্যাট-এর জন্য বাপের কাছে আবদার করতে এসে দ্বিধায় কেমন জড়সড় হয়ে গেছে।

সারা ঢাকায় ছেলেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার ধুম পড়ে গেছে। যাদের বাপের অবস্থা ভালো তারা হাফ সার্ট হাফ প্যাণ্ট পরে পায়ে 'প্যাড' লাগিয়ে হাটন কম্পটন-এর নাম উচ্চারণ করে বেশ অভিজাত ধরনে এই খেলার অনুশীলন করে।

আর তার নিজের ছেলে বেচারা এ পর্যন্ত একটা ক্রিকেট ব্যাট জোগাড় করে উঠতে পারে নি !

নজমুল যখন তাকে সাতটি টাকা গুণে দিলো ছেলের মুখে তখন সে কি পূর্ণতার হাসি। নির্ভেজাল সুখ বলে যদি কিছু থাকে, এই রকমেই শুধু তা অনুভব করা যায়। সাফল্যের উজ্জ্বল হাসিতে তার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে নজমুল পিতৃত্বের গাঢ় আনন্দ যেমন নিজের মধ্যে অনুভব করে, নিজের হারানো কৈশোরের কথা মনে করে তেমনি বেদনায় মন তার ভরে যায়।

নঈমাও আবদার জানায়ঃ স্যাকরাকে একবার ডাক দাও না। সালেহার (বড় মেয়ের নাম) জন্য দু'টা সোনার চুড়ি গড়াই।

তার কোনো পারিষ্কার জবাব না দিয়ে কিছুটা রহস্যের ভঙ্গীতে নজমুল জিজ্ঞেস করে : আর তোমার নিজের জন্য ?

থাক অত সোহাগে কাজ নেই—পরিমিত ধরনে ঝামটা দিয়ে নঈমা বলে—আমি চার ছেলের মা আমার এখন চুড়ি পরবার সখ নেই। তারপর কিছুক্ষণ থেমে—তার চেয়ে বরং এক কাজ করো, আমাকে আট আউন্স ভালো উল আর একটা ভালো প্যাটার্ণের বই এনে দিয়ো। সামনে শীতের জন্য তোমার একটা সোয়েটার বুনে দেবো।

তা'হলে ঘুষ খাওয়াটা একেবারে বিফল যাচ্ছে না দেখছি ! মনে মনে নজমুল ভাবে, বউ ছেলে এখন কতটা আপন মনে হয়।

ধরা পড়লো আচানক। শেষের দিকে উপরি নেওয়া নজমুলের এতটা সয়ে গেছলো যে, এ ব্যাপারে আর কোনো সাবধানতা সে দরকার মনে করতো না।

সারা অফিসে মস্ত হৈ চৈ। যারা ঘুষ নিতো না তাদের সংখ্যা অবশ্য খুব কম। তারা বেশী কিছু বক্র মন্তব্য করে নি—ঘুষ যারা হরদম খেয়ে

আসছে তাদের মুখেই নীতিবাক্যের খৈ ছোটে একেবারে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আমাদের মুখে একেবারে চুনকালি দিলো।

—একেবারে ভিজে বেড়ালটি বাবা, বাইরে থেকে মনে হয় খুব যেন সাধুপুরুষ।

দ্বিতীয় মন্তব্যটি সহকর্মী রফিক করে—যে দু'তিনবার নজমুলের কাছে ধার চেয়ে পায় নি। হয়তো সে-ই পুলিশে খবর দিয়েছিলো।

পরদিনই নজমুলকে 'সাসপেণ্ড' করা হয়।

এটা এক ধাক্কা বটে। হয়তো পরে ধরাধরি করে নজমুল খালাস পেয়ে যেতে পারে কিন্তু এই যে সে ঘুষ নেয় এটা সারা অফিসের লোক জানতে পারলো সে লজ্জা সে ঢাকবে কি করে?

নঈমার কাছে থেকে এই বিপর্যয়ের কথা বেশ কয়েকদিন লুকিয়ে রেখেছিলো। তবে তিন চারদিন উপরি উপরি অফিসে যেতে না দেখে নঈমা তাকে একদিন শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো: আজকাল অফিসে যাও না যে বড়।

—অনেক ছুটি জমা আছে, না নিলে পচে যাবে।

অবশ্য সে-জবাব বেশীদিন কার্যকরী হয় নি। মাসের প্রথম নজমুল যখন শুধু পঞ্চাশ টাকা নঈমার হাতে এনে দিলো তখন তার জবাবদিহি করতে গিয়ে নজমুলকে বলতে হয়েছিলো যে অফিসের বড় কর্তার সঙ্গে তার ঝগড়া হওয়াতে তাকে 'সাসপেণ্ড' করেছে। সে তার বড় কর্তার বিরুদ্ধে মামলা করবে।

সে-কথা শুনে নঈমা জ্বলে উঠলো একেবারে: মামলা করবে না ঠেঙা করবে। ফুটো কলসী তুমি, তোমার মুরোদ কত এই দশ বছরে সেটা কি আমি টের পাই নি, এখন কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে না খেয়ে মরো।

নজমুলও আর রাগ সামলাতে পারে নি। ঠাস করে নঈমার গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললো: তোমার কি ভাবনা, তোমার তো নাগর আছে, সেই কাচ্চাবাচ্চাদের খাওয়াবে।

রাগে আর অপমানে নঈমার মুখটা তখন দেখবার মতো—তার দৃষ্টি যেন আগুনের হল্‌কা।

কথা আর চাপা থাকলো না। নজমুল ও নঈমার পরিচিত সকলেই জানতে পারলো নজমুল ঘুষ নিয়ে ধরা পড়েছে। যতদিন জানাজানি হয়নি ততদিন পরিচিতদের কাছ থেকে কিছু কিছু ধার নিয়ে নজমুল কোনোমতে সংসারের খরচ জুগিয়েছে। সেই টাকা দিয়ে একেবারে গুম-হয়ে যাওয়া নঈমা নিজে আধা উপোস করে আর সকলকে দু'বেলা অন্ততঃ ভরপেট খাইয়েছে।

নজমুল লক্ষ্য করে, ইদানীং ইউনিভার্সিটির সে ছোকরা-আত্মীয় আবার বেশ আনাগোনা আরম্ভ করে দিয়েছে।

সমস্ত বাসার আবহাওয়া কেমন যেন স্তব্ধ ও ভারী হয়ে উঠেছে। নঈমা তার সঙ্গে আজকাল আর কথাই বলে না—নজমুল যেন খবিস নাপাক এক জীব। স্ত্রীর কোনো কোমলতাই তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। বড় ছেলেটাও যে বাপের কাছে মাঝে মাঝে আবদার করতো —তার দিকে আর একেবারে ঘেঁষে না। বাপের দিকে মুখ তুলে চাইতেও তার যেন বড় বাধে। কখনও চোখাচোখি হয়ে গেলে তখনই চোখ নামিয়ে নেয়। নিশ্চয় ছেলেটা কারও কাছে বাপের কীর্তির কথা শুনেছে।

সহসা নজমুল আবিষ্কার করে এক এক করে তার সমস্ত আশ্রয় তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। বউ এখন বেগানা আওরতের মতো মনে হয়। নিজের বলে আর যেন মনে হয় না।

যাক্ গে, শালার—যা হবার হবে। দরকার হলে, এই অবলম্বনহীনতা থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচাতে হয়, তা নজমুল জানে।

ধারও এখন আর কারুর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। সব কিছু জানতে পেরে নঈমার বাবা খবর পাঠিয়েছেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে নঈমা যেন দেশে চলে আসে—দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া সেখানে তাদের জুটে

যাবে। নিজেই এসে তিনি তাদের নিয়ে যেতেন তবে সে-পথ জামাই আর রাখোন।

নঈমা উল্টো খবর পাঠিয়েছিলো: বিপদের সময় স্বামীকে একা ফেলে রেখে সে বাপের বাড়ী যাবে কি করে।

আজকাল ভাত ডালের সঙ্গে আলুভর্তাও আর নঈমা জোগাতে পারে না। এরি মধ্যে বিয়ের সময়কার আংটিটা তার গেছে।

ভাত খেতে বসে নজমুল কিন্তু মন্তব্য করতে ছাড়ে না: নিজের জন্য বুঝি মাছ তরকারী রেখে দেওয়া হয়েছে, আমি বাইরে গেলে সেই ছোকরার সঙ্গে বসে খাবে।

নঈমা চিলবিলিয়ে উঠে বলেছিলো: এবার থেকে নিজের ভাত নিজে রেঁধে খায় যেন। চুরি করে ধরা পড়ে আবার তেজ দেখো না। ওর জন্য ভাত আমি আর রাঁধতে পারবো না।

তার জবাবে ক্ষিপ্ত হয়ে নঈমার দিকে বাসন পেয়ালা ছুঁড়ে মেরে খালি পেটে নজমুল উঠে যায়। বাসন পেয়ালা নঈমার হাত খানেকের ভেতর এসে কর্কশ এক শব্দ করে মাটিতে পড়ে যায়। ডালের ছিটায় নঈমার শাড়ীতে ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া হলুদ দাগ বসে যায়।

তারপর দু'দিন নজমুল বলতে গেলে বাড়ীমুখোই হয় নি—খায়ও নি। কিছুটা রাগ, কিছুটা হতাশা, নিজের প্রতি অশেষ কারুণ্য সব মিলে বেশ একটা ঘোরের সৃষ্টি করেছিলো। তবে খিদের জ্বালায় সেটা বেশী ক্ষণ টিকতে পায়নি। দু'আনার চিনাবাদাম আর তার সঙ্গে গলা-ভরা পানি খেয়ে নজমুলের পেটের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগলো।

অদ্ভুত জিনিস এই খিদে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নাড়ী পর্যন্ত একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে। মাথায় কেমন যেন ঝিমঝিম ভাব। চারি-দিকে চোখ-আঁধার-করা শূন্যতা।

পেটে যে দু'দিন ধরে দানা পড়ে নি—এর বাইরে নজমুলের কাছে আর কোনোও সত্য নেই। ছেলেমেয়েদের খাওয়া জুটছে কিনা সে-সম্বন্ধে

এখন তার, বাপ হয়েও আগ্রহ নেই। কি করে নিজের পেটের খিদে মেটানো যায় সেটাই নজমুলের কাছে এখন একমাত্র চিন্তা।

নঈমাকে বললে নিশ্চয় সে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু নঈমা, তার স্ত্রী, তার এতদিনকার সাথী, তাকে যে কথা বলেছে তার পরে তার কাছ থেকে, পুরুষ হয়ে, স্বামী হয়ে চাওয়ার গ্লানি সে সইবে কি করে।

নঈমাকে সে কি বলেছে খিদের তাড়নায় নজমুলের অবশ্য সে-কথা মনে থাকে না।

আচ্ছা সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়া ছোকরাটার বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে দেখা যাক কিছু টাকা ধার পাওয়া যায় কিনা।

সেই আশায় তাহের বাগ লেন থেকে বকসীবাজারের দিকে নজমুল হাঁটতে আরম্ভ করে দেয়। প্রথম কয়েক মিনিট ক্লান্তির ভাব তেমন ধরা পড়ে না, তবে টয়েনবি সার্কুলার রোড-এ পড়তেই পদক্ষেপ অনেকটা দ্বিধা জড়িত হয়ে আসে। জিন্নাহ্ এভিন্যুর কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে দুই রিক্সাকে-ছাড়িয়ে-আসা একটি দ্রুত ধাবমান মোটর গাড়ীর হর্ণের শব্দে হকচকিয়ে নজমুল প্রায় তাল সামলাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাল সামলে দেখে তার বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আর হাত পার ভাঁজে ভাঁজে কাপুনি।

—খুব বেঁচে গেছি, বাবা। পেটের খিদের কথাও ভুলে গিয়ে নজমুল নিজের মনে আওড়ায়। জিন্নাহ এভিন্যুর পরিপাটি লেবাসের দিকে চেয়ে খিদের খোঁচা যখন আবার প্রবল হয় তখন আর্তনাদের ধরনে নজমুল নিজেকে জিজ্ঞেস করে : কি থেকে বাঁচলাম ?

কার্জন হলের কাছে এসে নজমুলের আর হাঁটবার উদ্যম থাকে না। কম্পাউণ্ডের ভেতর গিয়ে এক পাশে ঘাসের ওপর চুপটি করে বসে কিছুটা জিরিয়ে নেয়। সমস্ত নাড়ী যখন ক্ষুধার জ্বালায় টনটন করে উঠছে তখন গাছের ওপর রোদের খেলা নজমুলের চোখে পড়ে। তারপর

সযত্নে রোপিত তৃণের ঘন শ্যামলিমার সঙ্গে স্তবকে স্তবকে উন্মোচিত, হলদে, লাল, গেরুয়া রঙ-এর কেনাফুলের কিরণ-দীপ্ত মিতালী হঠাৎ যেন নজমুলের চেতনা জাগিয়ে তোলে। মনে হয়, মাটির সমস্ত নির্যাস তৃণ ও ফুল টেনে নিয়ে রোদ আর আকাশকে উপহার দিচ্ছে।

এ-চিন্তাটা অদ্ভুত লাগে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মনে হয়—অনেকটা তার নিজের নাড়ীর জ্বালার মতো।

ভদ্রলোক নজমুলের আসাতে খুশী হন নি। কামরায় ঢুকেই সেটা যেমন নজমুল বুঝতে পারলো তেমনি কোণের ছোটো টেবিলে সাদা প্লেটের ওপর মুন্সীগঞ্জ-কলার হলদে কাঁদি দেখে দৃষ্টি তার সেখানে একেবারে আটকা পড়ে গেল। বুঝতে পারলো না কিছুক্ষণ : কলা চাইবে না টাকা।

তবে দু'দিনের ওপর খালি পেটে কলা খাওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে ভেতর থেকে সহসা বমির ভাবটা প্রবল হয়ে ওঠে। তাই চট্ করে টাকাই চেয়ে বসলো : পনেরোটা টাকা যদি দেন, সামনে মাসে শোধ করে দেবো।

ভদ্রলোক তার দিকে একবার সর্তক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন, পরে বললেন শীতল বৈষয়িক ভঙ্গীতে : পাগল হয়েছেন, মাসের শেষে অত টাকা পাবো কোথা?

জবাবটা আগে থেকেই নজমুল অনুমান করে রেখেছিলো—পাগল বিশেষণটি ছাড়া—অতএব খুব বেশী হতাশ সে বোধ করে না। আর কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়ায়।

বেরিয়ে আসবে এমন সময় পেছন থেকে ভদ্রলোকের গলা সে শুনতে পায় : পাঁচ টাকা হলে নিয়ে যেতে পারেন, আপনাকে আর শুধতে হবে না।

শেষের কথাটিই অনিশ্চয়তা বাধালো। শুধতে যখন হবে না নেওয়াই যাক না কেন। পরমুহূর্তেই ভাবে : এতে কি আর বেইজ্জতির বোঝা কমবে, আর এইভাবে গরমিল দিয়ে চলবেই বা আর ক'দিন?

বাইরে বেরিয়ে দেখে : রাস্তার মাঝখানে এক মরা কুকুর পড়ে আছে। মুখ থেৎলে শুধু মাড়িটাই আলগা হয়ে খসে পড়ে নি, নাড়ি-ভুড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। চোখে জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে দু'একটা দাঁড়কাক সেদিক এক পা এগুচ্ছে, এক পা পিছুচ্ছে।

এখন খিদের চেয়ে নিস্তেজ, নির্জিব ভাবটাই বড় হয়ে উঠেছে। গতি-ময় জীবনের প্রাণস্পন্দন চারদিকে দেখেও মনে তেমন কোনো অনুভূতি জাগে না। একটি ছোটো মেয়ে এক দোতলা বাসার জানালা দিয়ে তার দিকে চেয়ে ভারী মিষ্টি ধরনে হাসছে। নজমুলের প্রতিক্রিয়া হয় অদ্ভুত : দূর শালী !...হঠাৎ রাগে নজমুলের সমস্ত সত্তায় যেন আগুন বয়ে যায়—বউটা মাগী, বাচ্চাগুলো কার কে জানে, আর সব বেটা দাগাবাজ, খল। এই ভাবে বেঁচে থাকা...থু-থু থু-থু-থু।

বাসার ধারে মুদীর দোকানের কাছে এসে নজমুল টলমলে মাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। রাগ বেশীক্ষণ থাকে নি, কারণ খালিপেটে রাগ করতে গেলে মাথা তা বেশীক্ষণ বহন করতে পারে না। কিছু মুড়ি মুড়কী কিনতে পারলে বেশ হতো। পেট তাতে কিছুটা স্বস্তি পাবে। পকেট হাতড়িয়ে দেখে সেখানকার ভাঁজে কেমন করে যেন একটা আধুলি রয়ে গেছে। মুড়কীর সঙ্গে আরো কিছু কিনে নজমুল বাসায় ফেরে।

তকত্‌পোষেই নজমুল গা এলিয়ে দেয়। খিদে এখন অনেকটা সয়ে গেছে। পেটে আর সে কামড়-খাওয়া ভাব নেই। শুধু নিঃসাড় অবশতা ক্রমে ক্রমে গিলে-খাওয়া শূন্য।

কামরার বাইরে পরিচিত এক গুঞ্জন শুনে শেষবারের মত উত্তম সংগ্রহ করে নজমুল কান খাড়া করে থাকে। সেই ছোকরা আবার এসেছে।

নঈমা বলছে আদরের ধরনে—এতদিন পরে মনে হলো।

ছেলেটি বলে : এই তো তিনদিন আগেই এলাম।

—আরে তাই তো, এত ভুলো মন হয়ে গেছে ভাই। (ভাই আর

কেন—নজমুল বিড়বিড় করে) কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর ছেলেটি আবার বলে : এই কুড়িটা টাকা ভাই পাঠিয়ে দিলেন।

নজমুল ভাবে : রঙ্গটা বেশ জমছে।

এবার নঈমা যা বললো তার জন্য নজমুলের মন ঠিক প্রস্তুত ছিলো না—বড় উপকার করলে ভাই, তোমার ভাই বোধ হয় আমার উপর রাগ করে দু'দিন না খেয়েই আছেন। নঈমার গলার স্বরে খেদহয়া মমতা। মন আবার জেগে উঠতে চায়, ছেলেদের মুখ মনে পড়ে, সেই ছোটো মেয়ের মিষ্টি হাসি চোখের সামনে আবার ভাসতে থাকে। নঈমা, নঈমা……

আর্ত অনুভূতি কি যেন হাতড়ে বেড়ায়। কি যেন ফিরে পেতে চায়।

শেষবারের মতো নাড়ী নিঃসাড়তায় কুঁকড়ে ওঠে। একবার খেয়াল হয় কিছুটা মুড়কী খেয়ে নেয়—তাতে হয়তো চেতনার নতুন দু'এক তন্ত্রী বেজে উঠবে। তবে বাদুড়ের মতো ডানা ঝাপ্টে কালো হতাশা দ্রুত আসে আর তার তড়িৎ-তাড়নায় হাতটি যায় 'র‍্যাটম'-এর প্যাকেট-এ।

এখন বাকী থাকলো কোনোমতে এক গ্লাস পানি জোগাড় করা। তারপর পানির সঙ্গে র‍্যাটম এর সমন্বয় ঘটাতে যেটুকু জ্বালা।

যোগ-বিয়োগ

ঈশ্বরদী ষ্টেশন। রাত সাড়ে আটটা। ছুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম-এ পা ফেলবার জায়গা নেই। মানুষে গিজগিজ করছে। ছুমড়িয়ে-শুয়ে-থাকা কয়েকজন অসুস্থ যাত্রীকে কুকড়িয়ে-পড়ে-থাকা কুকুরদের মতোই অনাবশ্যক ও অসহায় মনে হচ্ছে। চলতে চলতে কেউ ফেলছে পানের পিক্। হন্তদন্ত হয়ে একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করছে: রাজশাহীর ট্রেন কি চলে গেল? তারপর জওয়াবের অপেক্ষা না করেই ডান হাতে লুঙ্গিটা একটু উপরের দিকে টেনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম-এর দিকে ছুট।—চাই গরম চা······পান বিড়ি তো আছেই।

এই গতি-চঞ্চল ও বিশৃঙ্খল আবহাওয়ার মধ্যে এক দম্পতি আবির্ভূত হয়। মেয়েটি বেশ সুশ্রী ও মুখের কোণে হাসি দেখে মনে হয় খোস-মেজাজী। ছেলেটির চেহারা যেমন চোখা, হাবভাব তেমনি সংযত। তাদের একত্র দেখে যে-কোনো পথচারীর মন খুশী হওয়ার কথা। খাসা মিলেছে বটে।

—এইখানে রাত ছুটো পর্যন্ত কাটাতে হবে, কলকাতার ট্রেন নাকি তার আগে আসে না। মেয়েটির দিকে কিছুটা তামাসা কিছুটা মায়ার দৃষ্টিতে চেয়ে ছেলেটি বলে।

—তা আসুক যখন খুশী। মেয়েটি সুখে যেন ঝলমলাচ্ছে—গল্প করেই সময় কেটে যাবে।

ছেলেটি সমর্থনের হাসি হাসে।

দু'জনে পুরুষদের 'আপার ক্লাশ ওয়েটিং রুম'-এর দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে ঢুকে ছেলেটি বলে : অসম্ভব ভীড় দেখি এখানে। চলো তোমায় মেয়েদের 'ওয়েটিং রুম'-এ রেখে আসি।

মেয়েটির মুখ হঠাৎ একটু ম্লান হয়ে যায়।—দু'জনে গোজাগুজি করে কোথাও থাকা যায় না?

—তারও উপায় নেই, আর যা হট্টগোল, আজকাল বোধ হয় 'আপার ক্লাশ ওয়েটিং রুম'-এ ইণ্টার ক্লাশের প্যাসেঞ্জাররাই বেশী থাকে, নইলে এতটা ঠাসাসাসি হবার তো কথা নয়। ছেলেটির মন্তব্য।

অগত্যা মেয়েদের 'ওয়েটিং রুম'-এই যেতে হয়। সেখানে আগে থেকেই মাঝবয়সী এক ভদ্রমহিলা তিনজন ছেলেমেয়ে নিয়ে অধিষ্ঠাতা। তাঁর স্বামীও তখন সেখানে ছিলেন। ভদ্রলোক অপরিচিতা এক যুবতীকে সেখানে প্রবেশ করতে দেখে যেন কুণ্ঠিত বোধ করেন, বলেন : আমার স্ত্রীর শরীর খারাপ তাই সঙ্গে আছি, আপনার আপত্তি থাকলে চলে যাবো।

মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলে, না তার কোনো দরকার হবে না, পর্দানশীন কোনো মেয়ে না আসা পর্যন্ত আপনি এখানেই থাকুন।

ছেলেটি দরজার বা'র থেকেই বলে : আচ্ছা তুমি আরাম করেই বসো, আমি পুরুষদের 'ওয়েটিং-রুম'-এ আছি। মাঝে মাঝে এসে খোঁজ করে যাবো।

ভদ্রলোকও বলেন : আমিও বেরোই—তারপর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে—'রিফ্রেসমেণ্ট রুম'-এ গিয়ে দেখি তোমার দুধটা গরম করলো কি না।

স্বামী বেরিয়ে যাওয়ার পর মেয়েটিকে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করেন : যিনি দরজার বাইর থেকে কথা বললেন তিনি বুঝি আপনার……

ভদ্রমহিলার কথাগুলি শেষ করতে না দিয়েই মেয়েটি মাথা বিশেষভাবে নাড়িয়ে জানায় যে, তাঁর অনুমানটি ঠিক।

—আপনার নাম কি? যেন মেয়েটির তিনি কত অন্তরঙ্গ সেই ধরনে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করেন।

—সালেহা।

—বেশ নাম। আজকালকার মুসলমান মেয়েদের কেমন সব উদ্ভট নাম রাখা আরম্ভ করেছে। কেউ বিম্বী, কেউ ক্যামেলিয়া, কেউ স্বাতী—নাম তো' নয় নখরা। আমার নাম কিন্তু মাহমুদা। মাঝবয়সী হলেও ভদ্রমহিলার কথায় কিছু ছেলেমি ভাব আছে।

—আপনারা যাচ্ছেন কোথায়? আগ্রহের স্বরে সালেহা জিজ্ঞেস করে।

—কলকাতায়। চিকিৎসা করাতে। আমার কিডনীর কি এক ব্যারাম হয়েছে, দু'বছর ধরে সারছে না। উনি বলেন, এখানে তেমন বড় ডাক্তার নেই, কলকাতায় চিকিৎসা না করলে এ-রোগ সারবে না। বয়স আন্দাজ করা মুস্কিল। তবে তিরিশের নীচে বোধ হয় হবে না। বেশ পেয়ারাপানা মুখ। যদিও গলায় বোধ হয় কিছুটা 'গরটার'-এর ভাব আছে। পরণে 'নাইলন'-এর আসমানী রঙ-এর এক শাড়ী আর সোনার বেশ কয়েকটা গহনা—সব কিছুতে স্বচ্ছলতা একটু বেহায়াভাবে উচ্চারিত।

অবশ্য মুখে মাহমুদা বেগমের কথাগুলো না ফুরাতেই সালেহা বলে: আপনার শরীর দেখে তো মনে হয় না আপনার এমন কোনো রোগ আছে।

—ওই পোড়া শরীরটাই তো খেলো—মাহমুদা বেগমের কথায় যেন এক খুশীর রেশ খেলে যায়—ডাক্তাররা তো সে জন্যই বলে আমার কোনো অসুখ নেই।

এতক্ষণ ভদ্রমহিলার ছেলেমেয়েরা এক কোণে চুপ করে বসে মায়ের সঙ্গে সালেহার কথোপকথন শুনবার ভান করছিলো। হঠাৎ মেয়েটি উসখুস করে ওঠে: বাইরে যাই আম্মা। এখানে বসতে আর ভালো লাগে না।

—বাইরে কোথায় যাবে?

—আব্বার কাছে।

—না মা, তোমার আব্বা এখনই আসবেন, একা বাইরে যেও না।

মেয়েটি গুম হয়ে আবার এক কোণে চুপ করে বসে থাকে।

—আম্মা খিদে পেয়েছে। এবার ছেলেটি—সব চেয়ে বড় বোধ হয়—তার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়।

—এত ঘন ঘন তোমার খিদে লাগে বাবা, এই তো খেলে।

ছোটো মেয়েটি আচানক ভ্যাঁ করে কেঁদে দেয়—কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে মাহমুদা বেগম জানতে পারেন বড় বোন তাকে অযথা চিমটি কেটেছে।

মাহমুদা বেগম বড় মেয়ের দিকে তাকিয়ে এবার তেড়ে ওঠেন: এক লহমার জন্য যদি স্বস্তি পাই এ বিচ্ছুদের জন্য। কেন ছোটো বোনকে চিমটি কেটেছিলি ? কেন ?

অপরিচিতার সামনে তাকে এইভাবে ধমকানোর জন্য বড় মেয়েটির মানবোধে লাগে, সেও ফোঁসফোঁস করা আরম্ভ করে দেয়।

এবার সালেহার দিকে আবেদনের দৃষ্টিতে চেয়ে মাহমুদা বেগম বলেন দেখছেন তো সংসারে কি সুখ। নিজে তো অসুখে ভুগছি, তারপর ছেলে মেয়েদের নিয়ে এই ঝক্কি—তারপর আকস্মিক—আপনার বোধ হয় এ ঝঞ্ঝাট নেই।

সালেহার মুখটা আরক্তিম হয়ে যায়।

সেই বিব্রতভাব থেকে সালেহাকে বাঁচান মাহমুদা বেগমের স্বামী, হাতে 'ফ্লাস্ক' নিয়ে ঢুকে। স্ত্রীর দিকে এগিয়ে গিয়ে ফ্লাস্কটি এক খালি চেয়ারে রেখে বলেন: এখনই গ্লাস-এ ঢেলে খেয়ে ফেলো, নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—দেখছেন তো কতদিকের ঠেলা, দুধ খাওয়ানো নিয়ে আবার আমার পেছনে লেগেছেন। মাহমুদা বেগমের কথায় ভাগ্যবতী স্ত্রীর নির্লজ্জ সুখ পুরোপুরি প্রকাশ পায়।

সালেহা যতক্ষণ কথা বলছিলো প্রায় ততক্ষণ প্রত্যাশা করছিলো নাসির একবার এসে তার খোঁজ করে যাবে। এর মধ্যে ভদ্রলোক অসুস্থা স্ত্রীর জন্য দুধ গরম করে নিয়ে এলেন, অথচ নাসির পুরুষদের 'ওয়েটিং রুম'-এ জমজমাট হয়ে বসে আছে। এখানে তার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না তাও একবার জেনে যাওয়া দরকার মনে করলো না?

যেন তার মনের কথা শুনতে পেরেছে এইভাবে নাসির বাইর থেকে দরজা ঠেলে ভেতরের দিকে কিছুটা দ্বিধার দৃষ্টিতে চাইলো। হাতে [illegible] কয়েকটা পত্রিকা।

সালেহা প্রায় মুখ ফুটে বলতে যাচ্ছিলো: আসো না ভেতরে। তার অবশ্য দরকার হলো না। কিছুটা সংকোচের সঙ্গে হলেও নাসির এবার ভেতরে ঢুকে পড়ে সোজা সালেহার পাশে এসে বসে। বলে: কোনো ভালো পত্রিকা পাওয়া গেল না, বই-এর একটা যা 'ষ্টল' দিয়েছে দেখলে ঘেন্না হয়।

খুশী হয়ে সালেহা বলে: এই ঢের হয়েছে, প্রায় ঘণ্টাখানেক তো কেটেই গেলো। বাকী তিন চার ঘণ্টাও চলে যাবে।

—একা একা বেশ আছো দেখা যায়—তারপর খুব আস্তে—ভদ্রমহিলার সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসেছো বোধ হয়।

—পুরুষদের মতো এত সহজে আমরা জমাতে পারি না। তুমি কোথায় গিয়ে জমিয়েছিলে এতক্ষণ? সালেহার কথার ভঙ্গীতে কিছুটা অনুযোগ ফুটে ওঠে।

—আর বলো না, খাটমলের জ্বালায় পুরুষদের ওয়েটিং রুম-এ বসবার যো নেই। বেশীর ভাগ প্ল্যাটফর্ম-এ ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—আমাকেও নিয়ে চলো না কেন? মৃদু অনুনয়ের স্বরে সালেহা বলে।

—আরে পাগল হয়েছো। যা ভীড়! চলতে চলতে তোমার পা কার মাথায় গিয়ে ঠেকবে। শেষে সর্বনাশ।

—আসলে তোমার নেবার ইচ্ছে নেই।

—এই দেখো আবার তোমার অনুযোগের পালা আরম্ভ হয়ে গেল—তারপর স্ত্রীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে—আচ্ছা পার্বতীপুরের ট্রেনটা যাক, তার পরে নিয়ে যাবো। এখন নিয়ে গেলে চারদিক থেকে হাজারো তৃষিত চোখ তোমায় শুধু গিলবে। বলে সে উঠে দাঁড়ায়—তারপর বকশিস্ স্বরূপ সালেহার দিকে এক হাসি ছুড়ে মেরে আবার প্ল্যাটফর্ম-এ বেরিয়ে যায়।

দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাহমুদা বেগম নতুন দম্পতিকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। যে ধরনে নাসির সালেহার পাশে এসে বসলো আর যে ভাবে তারা দুজনে মনের সুখে গল্প আরম্ভ করে দিলো তা মাহমুদা বেগমের চোখেও ঈর্ষার ঘোর এনে দিলো। তাঁর নিজের বিয়ে হয়েছে প্রায় বছর পনেরো হবে। বিয়ের প্রথম কয় বছর স্বামীর কাছ থেকে আদরের ঘটার কোনো কমতি হয়নি—চিঠি লিখতেন 'প্রাণাধিকে' বলে—তবে আজকালকার দম্পতিদের কূজনগুজনে এমন একটা নগ্নতা আছে যা দেখে নিজের অপসৃত যৌবনের কথা মনে করে মাঝে মাঝে মনটা বড় দমে যায়। তাঁর স্বামী এখনও তাকে যথেষ্ট খাতির করেন, তবে তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর স্বামীর কোনো জ্বালাময়ী আবেগ আছে কি না বা কোনোদিন একেবারেই ছিলো কি না—সে প্রশ্ন নতুন করে আবার তাঁর মনে জাগে।

এখন সংসারের নানা জালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন বটে, তবে রেশমী খাহেশ যে তাতে একেবারে ঘায়েল হয়েছে এমন নয়। শরৎচন্দ্রের বেশ কয়েকটা উপন্যাস তাঁর পড়া আছে, ক্লাশ নাইন পর্যন্ত তাঁর বিদ্যে হলেও। মাঝে মাঝে এখনও তাঁর সখ হয় সাবিত্রী বা রাজলক্ষ্মীর মতো তাঁকে যদি কেউ প্রবল দুরন্তভাবে ভালোবাসতো তা হলে বেশ হতো।

তবে তাঁর নিজের স্বামীকে সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রেমিক হিসেবে কল্পনা

করতে তাঁর বাঁধে—এই পনেরো বছরে ভদ্রলোকের সমস্ত নাড়ী-নক্ষত্র তিনি চিনে ফেলেছেন।

যদি সালেহার স্বামীর মতো—কথাটা ভাবতে গিয়ে মাহমুদা বেগমের মনে কাঁপন ধরে যায় আর অপরাধী আকাঙ্ক্ষার মুখোমুখি হয়ে মুখে তাঁর কেমন যেন হচকচানো ভাব ফুটে ওঠে—একটা প্রেমিক তাঁর জীবনে দেখা দিতো তবে স্বচ্ছলতার এমন বাহুল্য না থাকলেও তিনি বোধ হয় সেটা তেমন বড় ক্ষতি বলে মনে করতেন না।

সঙ্গে সঙ্গে সালেহার স্বামীর ওপর তিনি বিরক্ত হন বেশ। কেন, আমার স্বামী কি মানুষ নয় যে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে না? যেমন করে ঢুকলো তেমন করেই চলে গেলো। ঘরে আর একটা যে পুরুষ ছিলো তা যেন সালেহার স্বামীর ভাববারও অবকাশ হয়নি। এতো দেমাক তোমার কিসের জন্য, শুনি? বউ-এর তোমার এখন যে-বয়স তাতে আমি কি দেখতে তোমার বউ-এর চেয়ে থোড়াই খারাপ ছিলাম? একত্রিশ বছর বয়স হলেও, এখনও আমার মধ্যে দেখবার সমস্ত জিনিস একেবারে খতম হয়ে যায়নি।

মাহমুদা বেগমের আসল আক্ষেপ হলো: একবারও কেন সালেহার স্বামী তাঁকে ভালোভাবে দেখলো না।

ভদ্রলোক বললেন: দুধ খাওয়া হয়েছে, এইবার বিছানায় একটু জিরোও। গাড়ী আসতে এখনও অনেক দেরী।

তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে স্বামীর তীক্ষ্ণ নজর খেয়াল করে মাহমুদা বেগমের হঠাৎ-ওঠা জ্বালা মন থেকে একেবারে বেরিয়ে যায়। বাইরে বলেন: জিরোতে গেলেই তোমার ছেলেমেয়েরা কি এক কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। ওদের জ্বালায় কি আর আমার জিরোনো হবে?

—আচ্ছা ওদের আমি দেখবো'খন। তুমি এখন গড়াগড়ি দাও। বলে ভদ্রলোক ছোটো মেয়েকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে বসেন।

—তুমি বাইরে একটু বেড়িয়ে এসো গিয়ে। এত খাটলে চলবে কি করে? বলে মাহমুদা বেগম কিন্তু গড়িয়েই পড়েন।

—বেড়ানো থাক। মেয়েটাকে একটু ঘুম পাড়িয়ে নি।

সালেহা ভাবছিলো মাহমুদা বেগম সত্যিই ভাগ্যবতী! বিয়ে নিশ্চয় তাঁদের অনেক দিন হয়েছে অথচ এখনও ভদ্রলোকের স্ত্রীর সুখ-সুবিধের দিকে কি মমতাগভীর নজর। স্ত্রীর জন্য দুধ গরম করে আনিয়ে প্রায় নিজের হাতে সে-দুধ মাহমুদা বেগমকে খাইয়েও তাঁর ক্লান্তি নেই—স্ত্রী যাতে ভালোভাবে জিরুতে পারেন সেজন্য ছোটো মেয়েটিকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে বসেছেন।

অথচ নাসির সেই যে গেলো আর ফিরে আসবার নামও করছে না। মাত্র তিন বছর হলো তাদের বিয়ে হয়েছে—অথচ এরি মধ্যে এমন।

মাহমুদা বেগম বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন—অন্ততঃ কথা তিনি কিছু বললেন না। তাঁর স্বামীর কোলে তাঁদের ছোটো মেয়েটিও ঘুমিয়ে পড়েছে। ভদ্রলোক এখন মাঝে মাঝে সালেহার দিকে চাচ্ছেন—সে ঘোরালো চাওয়া লক্ষ্য করে সালেহা যেন কিছু অস্বস্তিই বোধ করে।

তবে এই উনিশ বছরের যুবতী তার কমনীয়তা ও যৌবনের সুপ্ত দেমাকে বুঝতে পারে না যে, মাহমুদার স্বামী তার দিকে বিশেষ কোনো প্রত্যাশার দৃষ্টিতে চান নি। চিরকাল সংসারের প্রয়োজন বিনা প্রতিবাদে মিটিয়ে এসে প্রৌঢ়ত্বের মুখোমুখি হয়ে যৌবনের সম্ভাবনাকে তিনি এখন নতুন করে আবিষ্কার করতে চান না। খাটুনীর পর শ্রান্ত মনে স্ত্রী ঘুমিয়ে থাকবার সময় তিনি সালেহার দিকে শুধু এই কারণে চেয়েছিলেন যে, বোধ হয় সালেহার দিকে তাঁর অবস্থার সঠিক বোধন কিছুটা ফুটে উঠবে।

তা কিন্তু উঠলো না। সালেহা বরং উল্টো ভাবছিলো: কামরায় এখন আরও একজন পরিণত বয়স্ক কেউ থাকলে ভালো হতো।

ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে কি আছে আর না আছে তা নিয়ে তাহলে তার এত মাথা ঘামানোর দরকার হতো না!

আচ্ছা নাসিরেরর সত্যি কি হলো? পার্বতীপুরের ট্রেনটা কি এখনও যায়নি? হঠাৎ সালেহার কাছে কামরার সমস্ত আবহাওয়াটা কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধকর মনে হয়।

কপাল ভালো। ছোটো মেয়ের ঘুম ভেঙে যাওয়াতে সে কাঁদা আরম্ভ করে দিয়েছে। তাতে মাহমুদা বেগমেরও ঘুম ভেঙে যায়। বিছানা ছেড়ে উঠে বলেন: দাও মেয়েটাকে আমার কোলে। তোমার কাজ নয় ওকে থামানো।

ভদ্রলোক এক অপ্রত্যাশিত কাজ করে বসেন—মার কোলে মেয়েকে দেবার আগে মেয়েটির গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেন।

—মারলে কেন মেয়েকে অমন করে, ও তোমার কি করেছে? মাহমুদা বেগম তাজ্জব হয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন।

—রাখো রাখো। ভদ্রলোক এবার তেড়ে ওঠেন। আদর দিয়ে মেয়েটার মাথা খেয়েছো তুমি। বলে রাগত পদক্ষেপে কামরা থেকে তিনি বেরিয়ে যান।

নাসির শেষ পর্যন্ত তার কথা রাখেই। এসে হাসিমুখে বলে: পার্বতীপুরের ট্রেন চলে গেছে। এখন ইচ্ছে করলে প্ল্যাটফর্ম-এ কিছু পায়চারী করলে পারো।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যেন সালেহা। এতক্ষণ এই রুদ্ধ কামরার ভেতর মাঝবয়সী প্রগলভা এক ভদ্রমহিলার সান্নিধ্যে ও শেষের দিকে তার স্বামীর অনিশ্চিত চাউনিতে মনটা তার বড় বিগড়ে গিয়েছিলো। এইবার অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি।

অধৈর্য্যের সঙ্গে দরজা ঠেলে সালেহা প্ল্যাটফর্ম-এ বেরিয়ে আসে। বাইরের মুক্ত অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হাওয়া গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে সালেহা

তার বুকের সমস্ত পাঁজরাগুলোতে টেনে আনে। তাতে শুধু তার শরীরই অনেকটা জুড়িয়ে যায় না, ভারাক্রান্ত মনটাও তার আরামদায়কভাবে হাল্কা হয়ে আসে।

প্ল্যাটফর্ম-এ ভীড় এখন কিছুটা পাতলা হলেও ঠাসাঠাসির ভাব যায়নি। যাত্রীদের মুখাভিব্যক্তিতে একই সঙ্গে শ্রান্তি, সচকিত ভাব ও প্রত্যাশা বেশ ফুটে উঠেছে। রাত্রি ঘন হওয়ার দরুন প্ল্যাটফর্ম-এর পরিমিত পরিসরে বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানি আরও খোলতাই হয়েছে। রহস্যের ভাষা তাই সেখান থেকে অপসৃত।

তবে দৃষ্টি একটু ছড়িয়ে দিলে কল্পনার খোরাক বেশ কিছু পাওয়া যায়। বাইরে অন্ধকার এখন বেশ জমজমাট হয়েছে। তারাখচিত কালচে আকাশ সে অন্ধকারকে তেমন তরল করতে পারেনি। অন্ধকার শুধু খণ্ডিত হয়েছে যেখানে 'সিগন্যালস্'-এর লাল চোখ মস্ত এক বিপদ সঙ্কেতের মতো জ্বালা হয়ে জ্বলছে। তারপর দূরে, অন্ধকারের শেষ প্রান্তে, দেখা যায় পিণ্ডের মতো এক হলুদ ঝলক। যেন নিজের সময় পেরিয়েই চটুল খামখেয়ালীতার সঙ্গে স্থানভ্রষ্ট হয়ে আকাশের চাঁদ শূন্যে নেমে এসে মাটির থেকে একটু উপরে ভাসছে।

ক্রমে প্ল্যাটফর্ম-এর অঙ্গন নীচে থেকে নড়ে উঠলো, কেঁপে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রেল লাইনের জঙ-এর রঙ-এ সাময়িক এক উজ্জ্বল হলুদ রঙ-এর আভা এলো; যাত্রীদের চীৎকার ও ছুটোছুটিতে সারা প্ল্যাটফর্ম-এ বেচে থাকার এক ক্ষণস্থায়ী জোয়ার এলো; দানবের শব্দ করতে করতে প্ল্যাটফর্ম-এর শেষ প্রান্তে এসে পোষ-মানা শ্রান্ত বলদের মতো ইঞ্জিনটা থেমে পড়লো ও দম নিতে লাগলো।

সব-কিছু অভিভূত মনে সালেহা দেখছিলো। এই যে বাইরের রহস্যঘেরা তারার-কটাক্ষেও-মনড় অন্ধকার, দূরের নিঃসীম শান্তি, তারপর সহসা প্রচণ্ড গতিবেগের ক্ষিপ্র মাধুরী—তার নিজের জীবনে সেগুলো যদি অবিকল পাওয়া যেতো! অন্ততঃ তার এই কুণ্ঠিত, নিত্য-বাঁধা চিন্ত-

সুষমার সময়। তারপর সেও যদি মাহমুদা বেগমের মতো মাঝবয়সী নিষ্প্রভতায় শুকিয়ে যায় তার কোনো আক্ষেপ থাকবে না—যদি এই রকম কোনো অতীতের দিকে সে মাঝে মাঝে ফিরে তাকাতে পারে।

—কি, বড় যে গম্ভীর হয়ে গেলে, মুখে রা টি নেই। রাগ করছো নাকি মানিনী? কৌতুকের স্বরে নাসির জিজ্ঞেস করে।

—না রাগ করবো কার ওপর? সালেহা নিজেকে বলতে শোনে।

—কেন নিজের স্ত্রীকে রাগাবার মতো পদার্থও কি আমার মধ্যে নেই? তেমনি স্ব-নির্ভর, মসৃণ স্বর নাসিরের জিজ্ঞাসায় আবার ফুটে ওঠে।

এক জায়গায় নাসির হঠাৎ থেমে পড়ে, বলে: থাক ঝগড়া না করে লোকদের ট্রেন-এ ওঠা দেখি।

সালেহাকেও তাই বাধ্য হয়ে সেখানে থামতে হয়।

সালেহা লক্ষ্য করে নাসির এমন কোণাকুণিভাবে দাঁড়িয়েছে যে, ট্রেনে লোক ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম-এর ডান দিকে সমস্ত পরিসরও সে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারে।

স্বামীর সান্নিধ্যে সালেহা নিজের মনের সমস্ত জ্বালা ভুলে গিয়ে আচমকা এক মন্তব্য করে: ট্রেন-এ চড়তে আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগে, মনে হয় এক নতুন জায়গার পর আর এক নতুন জায়গা দেখেই যাবো হরদম।

নাসির মুখে বলে: তা বটে। তবে তার দৃষ্টি আরও অনেকবারের মতো প্ল্যাটফর্ম-এর ডান কোণে নোলক-পরা এক তরুণীর ওপর নিবদ্ধ হয়। নেহাৎ গেঁয়ো মেয়ে—তার পোশাকে ও হাবভাবে সেটা নগ্নভাব ধরা দিয়েছে। তবে তার কচি মুখটা বড় মিষ্টি। তার আয়ত, ডাগর চোখে সুপারী বন ও পুকুরের নিষ্কম্প পানির ইশারা—শ্রান্ত শহুরে মনে যা বেশ বেশ এক কোমলতার পরশ বুলিয়ে দেয়।

সালেহাকে অতো অসতর্ক মনে করে নাসির কিন্তু ভুল করেছে। যখন নারীর সহজাত যে মন-ক্ষমতা দিয়ে সালেহা আবিষ্কার করে নাসিরের আগ্রহ ঠিক ট্রেন এ লোক ওঠা দেখতে নয় তখন তার সাবধানী চোখ মোড় ফিরে নোলক-পরা সেই ষোড়শী কি সপ্তদশীর উপরই আঁটকা পড়ে।

আর সঙ্গে সঙ্গে তার মন চন্‌চনিয়ে ওঠে। মনে হয় মাহমুদা বেগমের বিগত-যৌবন স্বামীর কথা।

বউ-এর ঘুমিয়ে-পড়ার মওকা নিতে গিয়ে যিনি সফল-কাম হননি। বরঞ্চ তাঁর স্ত্রীর প্রতি যে দরদ ও অনুরাগের ছবি তিনি এত যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছিলেন তা একজনের চোখে অন্ততঃ মস্ত এক ঘা খেয়েছে।

তবে তাঁর হয়ে এই বলবার আছে যে, হয়তো নিত্যপর্যটনজনিত শ্রান্তিতে মন তাঁর সাময়িকভাবে অবশ হয়ে এসেছিলো— তখন তিনি অপরের একটু দরদ চেয়েছিলেন।

কিন্তু নাসির কি বলে তার যুবতী শ্রীময়ী বউ-এর কথা ভুলে নোলকপরা সপ্তদশীর টানে প্ল্যাটফর্ম-এ এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিচরণ করে বেড়ালো? এই তিন বছরে এত সহজেই সালেহার সমস্ত সুষমা-শক্তি কি উবে গেছে?

—তোমাকে এখন বেশ ভাবাতুরা দেখাচ্ছে। স্ত্রীর দিকে ফিরে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে নাসির বললো। স্বামীর কথায় কি এক তীব্র শ্লেষ ছিলো। তারই তাড়নায় নাসিরের দিকে তাকিয়ে সালেহার মনে বেশ খটকা লেগে গেলো। সত্যিই কি নাসির নোলক-পরা মেয়েটিকেই দেখবার জন্য প্ল্যাটফর্ম-এ এতক্ষণ সালেহার অজান্তিতে ঘুরে বেড়িয়েছে? নাসিরের চোখ দেখলে কিন্তু সে কথা মনে হয় না।

অপরিচিতাকে দেখে নাসিরের মনে কিছুটা হয়তো ঘোর এসেছিলো। তবে নিশ্চয় সেটা জোয়ারের পর্যায়ে যায়নি। গেলে নাসিরের চোখ

এখনও এতটা পরিষ্কার থাকতো না, বাঁকা-বিদ্যুৎরেখার মতো ঝিলিক মেরে উঠতো।

সেই বোধনের খুশীতে দৃষ্টি একটু ছড়িয়ে দিয়ে সালেহা দেখতে পায় 'ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল'টি এর মধ্যে জ্বালাময়ী লাল চোখ পরিহার করে আশ্বাস ও কোমলতায় কখন যেন নীল হয়ে গেছে।

হাড়

রেলওয়েতে সামান্ত কেরানীর, অবশ্য মালগুদামের, চাকরী করে অবসর গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে যখন ইফতিকার সাহেব কলকাতার এক নাম করা অঞ্চলে খাসা এক তেতলা দালান তুলে ফেললেন, তাঁর পরিচিতেরা পরস্পরের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসলেন এবং তাদের হাসিতে আখেরী জমানা যে এসে পড়েছে তা বেশ স্বচ্ছতার সঙ্গেই ফুটে উঠলো। নিকট আত্মীয় মহলে অবশ্য টি টি পড়ে গেলো এবং ঈর্ষাজনিত ক্ষোভে ইফতিকার সাহেবের পরদাদা যে তাঁতি ছিলেন তাও এ প্রসঙ্গে অনেকে আবিষ্কার করে ফেললেন। অথচ, দেখা গেলো, ইফতিকার সাহেবের সততায় যাঁরা সবচেয়ে বেশী সন্দিহান তাঁরাই তাঁর ওখানে, দালান তোলা শেষ হলে, সবচেয়ে বেশী ঘোরাফেরা করছেন।

নতুন দালানের তিন কামরার এক ফ্ল্যাটে নিজের পরিবারের সকলকে ঠেঁসে বাকী ফ্ল্যাটগুলো ইফতিকার সাহেব ভাড়া দিয়ে দিলেন। বেগম ইফতিকার এবং তার দুলাল দুলালীরা এরকম ঝকঝকে, তকতকে তেমন না হলেও, ফ্ল্যাটে থাকবার রোমাঞ্চে জায়গার স্বল্পতার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন এবং শুকুরগুজার তাঁরা হলেন এই ভেবে যে খোদার রহম অবশেষে, যে ভাবেই হোক, তাঁদের অভাব-ক্লিষ্ট সংসারের ওপর পড়েছে। তাই বেগম ইফতিকার এবাদৎ ও তেলাওয়াতের দিকে সহসা খুব বেশী ঝুঁকে পড়লেন।

গরীব আত্মীয়রা যখন ইফতিকার সাহেবের নব-লব্ধ মহান নসীবের

সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের মানসে তাঁদের নতুন দালানে অসরীক আনেন তখন বিশেষ করে বেগম সাহেবার মুখ কেমন থমথমে হয়ে ওঠে। চতুর হওয়ার দরুণ বাইরে তিনি খোশ আলাপ করেন এবং খোদার রহমে পাওয়া তাঁর নবজাত ঐশ্বর্য্য বগল বাজিয়ে সকলকে দেখিয়ে তিনি এক সূক্ষ্ম তৃপ্তিও বোধ করেন। তবে অন্যদিকে তাঁর বাজপাখীর মতো শ্যেন চোখ দেও-য়ালে ফিক করে কেউ পানের পিক ফেললো কিনা তা দেখে বেড়ায় এবং কোনো রকমে যদি তাঁর ফ্ল্যাটের মহার্ঘতা শিথিল হবার সম্ভাবনা দেখা যায় তো তিনি তা নির্দয় স্পষ্টতার সঙ্গে ধরিয়ে দিতে ছাড়েন না। ফলে মেহমানরা, বিশেষ করে গরীব বলে, বড়ই বেইজ্জত বোধ করেন ও তাঁদের আলিবাবা আত্মীয়ের কাছে আর না এসে তাঁদের পেছনে গালি ও কটু কথার দামামা বাজান।

এমন সময় হঠাৎ এক বিপর্যয় হয়ে গেলো। ইফতিকার সাহেব, কি এক দরকারী কাজে ঢাকা যেতে বাধ্য হন যখন সেখানে তুমুল মারামারি ও হানাহানি চলছে। শুভাকাঙ্ক্ষীরা, প্রধানতঃ তাঁর বেগম সাহেবা ইফ-তিকার সাহেবকে ঢাকা যাওয়া স্থগিত রাখতে অনুনয় বিনয় করেন, তবে বড় দাঁও এর ঘ্রাণ পাওয়াতে তুচ্ছ স্ত্রী-লোকের, তাও দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে নাওটার মতো জড়িয়ে থাকা বিবির, কথায় কান দেওয়া তিনি সমীচান মনে করেন না। সেটাই কিন্তু, আফশোসের কথা, ইফতিকার সাহেবের জীবনের শেষ জুয়ো খেলা হয় এবং পরম জুয়াড়ী যিনি তিনি তাঁকে ডাক দেন। ডাক দেওয়ার কায়দাটা অবশ্য বিশেষ মনলোভা নয়, কারণ অপর সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন, অন্ততঃ তাই সকলে অনুমান করেন যেহেতু তাঁর শরীর খুজে পাওয়া যায় নি। কি ভাবে তাঁকে মারা হলো, মেরে তাঁর শরীরকে টেনে হিঁচড়ে কোথাও নেওয়া হোল তা কিংবদন্তীর পর্যায়েই রয়ে গেলো শেষ পর্যন্ত, যদিও দু' একজন আত্মীয় প্রচণ্ড ধার্মিকতায় সহসা উদ্বুদ্ধ হয়ে এর মধ্যে খোদার অদৃশ্য হাত খুঁজে পেলেন।

বেগম সাহেবার মনে এ আঘাত কঠিন হয়েই বেজেছিলো ; তবে তিনতলা দালানের নধর শোভা তাঁর সে জ্বালার ওপর অনেকটা বরফ পানি ঢেলে দিলো। দুলাল দুলালীদের ব্যাপারেও অনেকটা তাই—যেন এই নতুন কোঠা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ দুনিয়ায় তাদের মরহুম আব্বাজানের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে এসেছিলো। বিশেষ করে যখন প্রকাশ পেলো আব্বাজান মারা গিয়েও ব্যাঙ্কে বেশ হাসি খুশী ধরনের এক পরিমাণ রেখে গেছেন তখন মৃত ইফতিকার সাহেবের রুহ্ এর প্রতি দুই ছেলে একটু সদয় হয়ে উঠলেও চৌরঙ্গীকে উল্টে পাল্টে দেখতে তারা কসুর করলো না। তাই, মাস দুয়েক যেতেই দেখা গেলো, দুই ছেলেরই জন্য, বড়টার বয়স কুড়ির বেশী নয়, বেশ তাজা ও জোয়ান গোছের দুই দুল্‌হিন বিবির আবির্ভাব হলো এবং আধা বছর পার না হতেই দুল্‌হিন বিবিদের তাজা ভাব আর থাকলো না, জওয়ানী থাকলেও। রোগ ধরা পড়বার পরও চিকিৎসা করাতে যখন ছেলেরা রাজী হলো না, বেগম সাহেবারই প্ররোচনায়, তখন নতুন আনা বউরা শাশুড়ীর ওপর মনে মনে ক্ষেপে উঠলো। ক্ষেপাতেই শেষ। অন্যদিকে বেগম সাহেবা ফুলতে ফুলতে প্রায় ফুটবল হয়ে গেলেন, তবে ঠিক ফেটে পড়-বার আগে এমন এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেলো যে তার ধাকায় শরীর তাঁর আবার হাল্কা হওয়া আরম্ভ করে দিলো। দেশ হলো ভাগ; কলকাতা পড়লো অন্য পক্ষের ভাগে। দেশ চুলোর যাক ভাগাভাগি থেকে কাটা কাটি হোক তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না বেগম সাহেবার, তবে তাঁর দালানের কি হবে সেকথা ভেবে চোখ থেকে তাঁর নিদ উবে যায়। নিজে তিনি ভাবেন : থেকেই যাই কলকাতায়, এখন আবার পাততাড়ি গুছিয়ে কোন্ জংলায় যাবো। তবে ছেলেরা অন্যরকমের সলাহ্ পরামর্শ দেয়। এখন আর কলকাতায় থাকা চলবে না, তারা বলে, জান-মাল মুসলমানদের এখানে আর নিরাপদ নয়। বিশেষ করে তাদের। কারণ বিগত দাঙ্গায় দু' ভাই মিলে তারা প্রায় জন কুড়ি হিন্দু খায়েজ করেছে।

বেগম সাহেবা ছেলেদের সম্বোধন করে বলেন : তোরা মাস্তম বাচ্চারা কাউকে ঘায়েল করেছিস এ তোদের সব চেয়ে বড় শত্রুরাও সন্দেহ করতে পারবে না।

মায়ের কথা শুনে ছেলেরা খুব খুশী হয়েছে এমন মনে হলো না, বড় ছেলে ভারী গলায় বললো : তুমি যে আমাদের কি ভাবো আম্মা, আমার হাতের তালু কতবার লাল হয়ে উঠেছে তার হিসেব দেওয়া মুস্কিল। বলে বড় ছেলে অতীত দিনের সে-সব ছবি নিজের চোখের সামনে জীবন্ত করবারই বোধ হয় চেষ্টা করে।

—মারবোনা শালাদের, হিংস্র স্বরে মেজ ছেলে বলে। আব্বাজানকে ব্যাটারা খুন করে নি? সহসা অতীতের এক তিক্ত অধ্যায় মেজ ছেলের অসতর্ক কথায় হুড়মুড় করে এসে পড়ায় সাময়িকভাবে বিকল হয়ে যায় বেগম সাহেবার মন। এবং তাঁর ছেলেদেরও তাজ্জব করে হুস হুস করে কেঁদে ওঠেন বেগম সাহেবা : তোর আব্বা আজকে বেঁচে থাকলে কি আর আমাদের এমন দুর্দশা হোত।

তবে আত্মীয়রা এক এক করে সকলে কলকাতা ছাড়া আরম্ভ করে দিলে বেগম সাহেবার মনও বেচেয়ন হয়ে ওঠে। এমন যে আত্মীয়দের তিনি খুব খোঁজ করেছেন বা তাঁদের শুভকামনা করেছেন অথবা যেচে ডাকিয়েছেন এমন নয়, তবে এখন দল বেধে তারা সকলে সরে যাওয়াতে বেগম সাহেবা নিজের দুর্বলতা ও অসহায়তা, তাঁর মস্ত দালান থাকা সত্বেও, এই প্রথম অনুভব করেন। এই অনুভূতির ঠেলাই, দু'একজন আত্মীয়ের কাছে নিজে উপযাচিকা হয়ে গিয়ে তিনি তাঁদের সলাহ্ চান, যদিও যতদিন অবস্থার স্রোত অনুকূলে ছিলো তিনি ওদের কারও কোনো তোয়াক্কা রাখেন নি।

বেগম সাহেবাও একদিন তাই ছেলে মেয়ে ও দুল্‌হিন বিবিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও অনেকটা পরিপুষ্ট হয়ে নিজের নসীবের সন্ধানে ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হন।

নসীব, দেখা গেলো, বেগম সাহেবার অনুগত দাস। যেখানেই তিনি হাত দেন, সোনা না হলেও রূপো ফলে। মাস খানেক মাত্র এক ভাড়াটে বাসায় থাকবার পর বক্সীবাজার অঞ্চলে তিনি এক চমৎকার বাড়ী খরিদ করে ফেলেন এবং রিকুইজিশান বোর্ডের বড় কর্তা কি ছোটো কর্তা বা হয়তো মাঝারি কর্তার হাতের তালু ঘসে সেখানেই বিরাজ করা আরম্ভ করে দেন।

সকলেরই তাক্ লেগে যায় এবং হাজারো চেষ্টা করেও যাঁরা মনোমতো একটা থাকবার জায়গা পান নি ঈর্ষায় তাঁদের চোখ, বেগম সাহেবার খোশনসীব দেখে, টাটাতে থাকে। খরিদ করা বাড়ীটা তেমন বিরাট না হলেও পরিসর তার বিশাল। পুকুর পর্যন্ত আছে, তার নানা রকমের গাছের পরস্পরকে জড়িয়ে ধরা ও আটকে-রাখা সমারোহে বাড়ীটার বিস্তৃতি প্রায় ভয়াবহ মনে হয়। বাসা পেয়ে নতুন সংসার গুছাবার নেশায় মশগুল থাকবার দরুণ কলকাতায় ফেলে আসা, আকাশের দিকে মুখ করা, রাস্তার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকা নতুন দালানের কথা কারুরই তেমন মনে পড়ে না। সমস্ত বাড়ীটাকে নতুন ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে এতই তাঁদের মানস।

মাঝে মাঝে সখ করে বাছাই করা আত্মীয়দের ডেকে বেগম সাহেবা তাঁর নতুন বাড়ী সকলকে ঘুরে ফিরে দেখান ; কি ভাবে সমস্ত বাড়ীটাকে একদম নতুন করে গুছবার ও সাজাবার খেয়াল তাঁর আছে সে-সম্বন্ধেও ছিটে ফোটা ধরনের দু'একটা আভাস দেন। বর্ষীয়সী ও টাকা পয়সাওয়ালী, দোদুল দোলা শরীরের অধিকারিণী এক আত্মীয়া খেদ মেশানো স্বরে বলেন তাজ্জবের ভাবকেও কিছুটা উচ্চারিত করে : তোমার নসীব দেখে তাক্ লেগে যায় জাফরের মা, আসতে না আসতেই এখানে এমন একটা চমৎকার বাড়ী পেয়ে গেলে ?

—সবই খোদার মর্জি, গভীর ধর্মোন্মাদনায় বেগম সাহেবার কণ্ঠ কেমন পূর্ণ হয়ে যায়, আর জাফরের আব্বার নেহ খেয়াল।

খোদার মর্জি তো বটেই। বর্ষীয়সী আত্মীয়া জাকরের আব্বা সম্বন্ধে মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। স্বামীর প্রসঙ্গ এত সহজে ধামা-চাপা পড়ে গেলো এটা বেগম সাহেবার কাছে তেমন ভালো লাগলো না, তাই তিনি আবার বলেন : উনি যদি আমাদের জন্য অত না করে যেতেন তো কি দশা হোত আজকে আমাদের। সে কথা কল্পনা করেই কথা শেষে হয়তো বেগম সাহেবা চমকে উঠবার ভাব দেখালেন।

কি ভাবে জাকরের আব্বা পরিবারের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করে গেছেন তা নিয়ে টাকা-পয়সাওয়ালী আত্মীয়ার মনে সংশয় থাকলেও তা গোপন রেখে বাইরে তিনি শুধু বলেন : আহা বেচারা কি ভাবে জান-হারালো, ঢাকাতে মারা গিয়ে ঢাকাতেই সে তার নিকট জনকে মরণের পরে টেনে আনলো।

সাময়িকভাবে আবার বেগম সাহেবা স্তম্ভিত হয়েপড়েন হয়তো তাঁদের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের কোনো এক স্মরণীয় বা আবেগে মেদুর ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়, হয়তো অন্য কিছু। ধীরে ধীরে নতুন সংসার আবার সিজিল হতে আরম্ভ করে। এক এক বার কলকাতা থেকে জিনিসপত্তর আসতে থাকে। কামরাগুলো ভরতে থাকে। এখন, সংসার যখন বেশ কিছুটা গুছিয়ে ফেলেছেন তিনি, কলকাতার দালানের কথা প্রায়ই মনে পড়ে বেগম সাহেবার। কিশোরী যখন তরুণী হয় ও প্রথম প্রেমে পড়ে তখন প্রেমাস্পদকে ছেড়ে আসতে তার যা কষ্ট লাগে তার চেয়েও বেশী বোধ হয় কষ্ট পান বেগম সাহেবা তাঁর সেই ঝক্‌ঝকে, শুভ্র ধরনের দালানের কথা ভেবে যার প্রত্যেকটি ইট তাঁর কাছে কলিজার মতো প্রিয়। যারা দেশ ভাগ করলো এবং এ-ভাগাভাগি যারা মেনে নিলো তাদের উভয়ের উপরই বেগম সাহেবা সমান ভাগে খাপ্পা হয়ে উঠলেন তবে নিষ্ফল ক্রোধের বিলাসিতা তাঁর পছন্দ নয় বলে তাঁর অস্তগামী যৌবনের এই নতুন প্রেমিককে তিনি সবলে আটকে ধরলেন।

ঢাকা সহর নতুন লোকে এখন গমগম করছে। রাস্তা দিয়ে চলা

দায়। সকলের মুখেই উদ্দীপনা। সামনে দৃঢ় পদক্ষেপে এগুলে অচিরেই এক রওশনদার মঞ্জিলের খোঁজ পাওয়া যাবে—এ ভাবই যেন সকলের চোখেমুখে জল জল করছে। বেগম সাহেবা সাইকেল রিকসার সামনে পর্দা টাঙ্গিয়ে মাঝে মাঝে বেরোন এবং পর্দার ফাঁক দিয়ে পুরান নগরীর হঠাৎ উথলে আসা দ্বিতীয় যৌবন চোখ ভরে দেখেন যদিও তাঁর নিজের চোখে ক্ষুধার ভাবটি তাঁর অজান্তিতেই ফুটে ওঠে। অবশ্য সকলের অলক্ষ্যে, তাঁর জীবনেও দ্বিতীয় যৌবন এসেছে এবং তাঁর নতুন প্রেমিক একটু হতশ্রী হলেও তাকে মেজে ঘসে তিনি এমন করে তুলতে বদ্ধপরিকর যে প্রথম স্বপ্ন-কুমারের কথা যেন তাঁর আর মনে না পড়ে।

দুল্‌হিন বিবিরা শাশুড়ীকে সব সময়ই প্রায় এড়িয়ে চলতে চায় এবং বেগম সাহেবাও তাদের শরীরে আগেকার সে তাজা ভাব আর একটুও নেই লক্ষ্য করে গভীর তৃপ্তি অনুভব করেন, যদিও বাইরে তারা শরীরের যত্ন করছে না বলে তাদের স্নেহ-মধুর গঞ্জনা দিতে ভোলেন না। দুল্‌হিন বিবিদের শরীর থেকে রস টেনেই বোধ হয় বেগম সাহেবার নতুন প্রেমিক দিন দিন শরীরের খোলস বদলাতে থাকে এবং একদিন নিজের জৌলুস জাহির করে সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

—বাঃ বেশ দেখতে হয়েছে বাড়ীটা। জাফর মন্তব্য করে।

হবে না, আম্মা কি ওর পিছনে কম খেটেছেন। জাফরের সঙ্গিনীর টিপ্পনী।

—খেটে খেটে আম্মার শরীরটা একদম গেছে। জাফর বলে। তবুও তো মুখে তাঁর হাসি এখন আর ধরে না। কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে জাফর-সঙ্গিনী। জাফর শুধু বলে: আহা, আব্বা আজকে নেই, থাকলে বাড়ীটা দেখে কি খুশীই না হতেন।

—আম্মার খুশীর ঘটা দেখে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা তাজ্জবও বনে যেতেন—সহজ কথাকে ঘোরালো করতে চায় বড় দুল্‌হিন বিবি।

—আহা খুশী হবেন না আম্মা, জাফর বলে, বেচারী আমাদের জন্ত খেটে খুটে বাড়ীটা কি সুন্দর দাঁড় করিয়েছেন দেখো না।

মুচকি হেসে তাই হয়তো দেখবার চেষ্টা করে জাফরের বউ যার নিজের যৌবন দুর্বোধ্য কারণে এরই মধ্যে অনেকটা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

খুব ধুমধাম করে মওলুদ পড়ানো হলো। আত্মীয় আত্মীয়ারা প্রায় সকলেই এলেন এবং এক বাক্যে স্বীকার করলেন যে বেগম সাহেবা এই এত অল্প সময়ের মধ্যে এত সুন্দর করে বাড়ী সাজিয়ে বস্তুতই অসাধ্য সাধন করেছেন। আর কারুর পক্ষেই এটা করা সম্ভব হতো না। কত কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে যে বেগম সাহেবা প্রায় জংলায় ভরা এ বাড়ীটা গুছিয়ে এনেছেন তা সমবেত মেহমানদের সবিস্তারে বলে অবশেষে খোদার কাছে তিনি শুকরিয়া জানান। যারা অন্তরঙ্গ তাঁদেরকে প্রায় কাঁদো কাঁদো ধরনে বলেন—আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ, আজকে তিনি নেই তবে খোদা কি মর্জিতে কি কাজ করেন নাদান আমরা তা কি বুঝতে পারি ?

অন্তরঙ্গরা প্রবোধ ও সান্ত্বনা দেন ও খোদা যে সব কিছু ভালোর জন্যই করেন তাও তাঁরা বলতে ভোলেন না। সান্ত্বনায় বেগম সাহেবার অন্তর্জালার তীব্রতা যখন একটু কমে তখন বাইরের দিকে তিনি চেয়ে দেখেন পুকুর ধারে কয়েকটা পরস্পরের বাহু-বদ্ধ গাছপালা তাঁর দিকে অশ্লীল কটাক্ষ নিক্ষেপ করছে এবং নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে যেন দুর্নিবার কৌতুকে হাসছে। সে-হাসি লক্ষ্য করে বা কল্পনা করে বেগম সাহেবার বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে। মৌলুদ খাঁ তখন প্রিয় নবীর প্রশংসা বাণী আরম্ভ করে দিয়েছেন মিলাদ সমাপনান্তে। এর পরে মোনাজাত করবার পালা। আজকে রাতে বেগম সাহেবা মোনাজাত করে কি চাইবেন খোদা তালার কাছে তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।

পরের দিন ভোরের দিকে সদলবলে বেগম সাহেবা পুকুরের কাছে যে গাছগুলি গতরাত্রে তাঁর দিকে ইতর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো সেখানে

এসে দাঁড়ান। হাওয়াতে গাছগুলির নাচন-দোলা দেখলে মন প্রফুল্ল হওয়ারই কথা, তবে বেগম সাহেবা তাদের দিকে কেমন যেন কুটিল ভঙ্গীতে চেয়ে থাকেন। গাছগুলির মনের কামনা বুঝতে পেরে শরম-দিল হন প্রৌঢ়ত্বের প্রথম ধাপে আসা বেগম সাহেবা। তাঁর অন্তঃস্থল চিরে গাছগুলির দৃষ্টি আরও ভেতরে গেঁথে গেছে, মনে হয় সেখানে বেগম সাহেবার নগ্ন কামনা সব ছটফটিয়ে মরছে। গাছগুলির বেয়াদপী আর সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ উন্মত্তার মতো ছেলে ও ছুলহিন বিবিদের হচচকিয়ে তিনি সামনে পড়ে থাকা এক লাঠি তুলে তাদের আগাগুলিকে ঠেঙ্গাতে থাকেন। আর এক সময় সেই লাঠির মাথায় ভর করে সেই পরস্পরের সাথে বেহায়াভাবে-নুয়ে-পড়া গাছগুলির ভেতর থেকে সকলের চোখের সামনে বেরিয়ে আসে এক টুকরো শক্ত, ভেতরে ফাঁক হয়ে যাওয়া, হাড়। সেদিকে সম্মোহিতের মতো সকলে চেয়ে থাকেন।

জাফর বলে: এ যে দেখতে অনেকটা মানুষের হাড়ের মতো, আম্মাজান।

জাফরের বউ হাড়ের রহস্যের ওপর আলোক সম্পাত করবার চেষ্টা করে: বোধ হয় এখানে কোনোদিন এক মরা মানুষকে গোর দেওয়া হয়েছিলো।

আৎকে উঠে বেগম সাহেবা প্রতিবাদ জানান: হিন্দুদের বাসা তো ছিলো এটা, এখানে আবার কাকে গোর দেওয়া হবে।

বোধ হয় কোনো মুসলমানকে মেরে এখানে পুতে রেখেছিলো। জাফরের বউ এত সহজে এবার তার শাশুড়ীকে ছাড়বে না যাঁর ছেলে তার আঠারো বছরের দেহে এরি মধ্যে ঘুণ ধরিয়েছে। রোষান্বিত ও বিদ্বেষ ভরা চোখে বেগম সাহেবা বড় ছুলহিন বিবির দিকে চান, তবুও হাড়ের দিকেই তাঁর নজর ফিরে আসে। কিছুতেই মন থেকে এ-কথা তিনি ঝেড়ে ফেলতে পারেন না যে এ হাড় বোধ হয় তাঁর মৃত স্বামীরই দেহাবশেষ। খুন করে হয়তো এ বাড়ীতেই তাঁকে এনে গোর দেওয়া

হয়েছিলো পাশাপাশি একসঙ্গে বেড়ে ওঠা মন্দ-স্বভাব গাছগুলির নীচে। বেগম সাহেবার মনে হয়: মৃত স্বামীর কবর হয়ে বিরাজ করছে তাঁর এই এত সাধের বাড়ী, যে বাড়ীকে যৌবনান্তে তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। দুশ্চরিত্র প্রেমিকের মতো ভোরের আলোয় ঝকমক করা এ বাড়ী তাঁর দিকে তাকিয়ে চটুল ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে অবিরত হেসেই চলেছে আর তাঁর সতীন হয়ে দাঁড়িয়ে বড় দুল্‌হিন বিবি হাড়ের দিকে চেয়ে তাঁর মনের কথা জানতে পেরে নিস্তব্ধ অবজ্ঞায় চেয়ে আছে।

গতরাতে গাছগুলি সে জন্যই বুঝি তাঁর দিকে অমন অশ্লীল ইঙ্গিতের ভঙ্গীতে চেয়েছিলো। দ্বিতীয় প্রেমিক হলো স্বামী-হন্তা। বড় দুল্‌হিন বিবির দিকে বেগম সাহেবা আর চাইতে পারেন না।

মেকী সোনা

ইউনিভার্সিটিতে যখন শহীদ পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, জাপানীরা মিত্র-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দেশের অবস্থা তাতে বেশ কিছু ঘোরালো হয়ে ওঠাতে পড়াশুনোয় মন বসানো অনেক ছাত্রের পক্ষেই, ছাত্রীদের কথা শহীদ জানে না, কঠিন হয়ে উঠলো। তাতে যে কোনো ছাত্রের মনে বড় রকম কোনো হতাশা দেখা দিলো—এমন অবশ্যি নয়। বরং পড়াশুনায় গাফিলতি করবার এক বাহানা পেয়ে মনে মনে খুশীই হলো তারা—পরীক্ষাকে যারা বরাবর অত্যন্ত বিরাগের দৃষ্টিতে দেখে এসেছে!

ছাত্র হিসেবে কোনোকালেই শহীদের তেমন নাম ডাক ছিলো না। তবুও নামজাদা ও জবরদস্ত ছেলেদের নিত্য সহচর হওয়ার দরুণ ইউনি-ভার্সিটি মহলে অনেকেই তাকে চিনতো। যে-দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলো শহীদ, তারা সকলে নিজেদের মর্জি মাফিক চলতো। কারও বড় একটা তোয়াক্কা করতো না; ইচ্ছে হলে ক্লাশ করতো, ইচ্ছে না হলে ক্লাশ থেকে অনুপস্থিত হয়ে রেস্তোরাঁয় আড্ডা জমাতো বা দৌড় দিতো সিনেমায়। অন্য কোনো দল যদি কোনো ব্যাপারে তাদের ওপর টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করতো সম্মিলিতভাবে খাপ্পা হয়ে উঠতো তারা। ছাত্রীদের মধ্যেও তাদের জনপ্রিয়তা ও সমর্থন থাকায় মাসে একবার 'ভ্যারাইটি' শো'র বন্দোবস্ত করে তারা সভা গুলজার করে রাখতো।

যতক্ষণ শহীদ দলের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতো, সময় কেটে

যেতো অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়। নির্জনতার মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার জন্ম-লব্ধ নিঃসঙ্গতাবোধ শাখা-প্রশাখায় পরিপুষ্ট হতো। বাড়ীর অবস্থা স্বচ্ছল নয় বলে শহীদকে বাধ্য হয়ে কোলকাতায় এক সঙ্গতিপন্ন পিতৃবন্ধুর বাসায়, তাঁর মহানুভবতার উপর নির্ভর করে, থাকতে হয়। টিউশানী করবার ইচ্ছে না থাকলেও হাত খরচ চালাবার জন্য তাও তাকে করতে হয়। তবুও এই চড়া বাজারে সে নিজের অত্যন্ত দরকারী সব জিনিসও সব সময় খরিদ করতে পারে না; এক বই কিনতেই প্রচুর টাকা বেরিয়ে যায়।

অবশ্য তাকে টানে এমন বন্ধুর সংখ্যা খুব কম নয়। রেস্তোরাঁয় জমিয়ে বসা অথবা সিনেমা দেখা, বন্ধুদের সঙ্গে তারও ভাগ্যে জুটে যায়! প্রতিদানে কিছু না করতে পারবার অক্ষমতায় শহীদ নিজের নসীবকে নীরব অভিশাপে বারংবার বিড়ম্বিত করে এবং নিজের পর-নির্ভরতার বহর দেখে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হয়।

তার মনের অবস্থা যখন এমন, নতুন-খোলা সরবরাহ বিভাগে আচানক তার এক ভালো মাইনের চাকরী হয়ে যায়। বেজায় খুশী হয় শহীদ। অনটনের ভাব এইবার এই প্রথম ঘুচবে বোধ হয়। প্রথম প্রথম তো নিজের সৌভাগ্যের কথা বিশ্বাস করতেই দ্বিধা হয় তার। তারপর যখন জিনিসটা সে পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে পারে, ইউনিভার্সিটির সহপাঠিদের কাছ থেকে সাড়ম্বরে বিদায় নেয় সে, এবং তাদের সকলকেই প্রচুর খাইয়ে তাদের মধ্যে কারুর কারুর বদহজম করিয়ে দেয়।

প্রথম যখন শহীদ মাইনে পেলো তখন তার সঙ্গে একজন নার্স জুটে গেছে। কম্‌সিন্‌ বয়স, টগবগে স্বাস্থ্য, বসন্ত-বিক্ষত বদন। তাকে নিয়ে শহীদ এক অবাক কাণ্ড করে বসে। তার সঙ্গে ট্যাক্সী করে বেড়াতে যায়, সিনেমায় আনাগোনা করে, নিউমার্কেট-এ গিয়ে তার জন্য উপহার কিনে দেয়—এবং সব কিছুর যা পরিণতি সুদে আসলে তা আদায় করে নিতে

ইতস্ততঃ বোধ করে না। উত্তুঙ্গ যৌবনের উদগ্র ক্ষুধায় নিজেকে নিস্মার করবার জন্য শহীদ যেন বদ্ধপরিকর।

এমনি করেই ত্বরিত বেগে প্রায় বছর তিন কেটে যায়। ইতিমধ্যে অবশ্যি নার্সের বদলে ষ্টেনোগ্রাফার. ষ্টেনোগ্রাফারের বদলে শপ-এসিষ্টেন্ট, শপ-এসিষ্টেন্ট-এর বদলে বার-মেইড ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের অর্ধ-কুমারী-দের সঙ্গে শহীদের নিবিড় পরিচয় হয়ে গেছে যার ফলে মাস তিনেক ধরে তাকে এক সুবিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকতে হয়েছিলো। যেমন আচানক চাকরী পেয়েছিলো শহীদ, তেমনি আকস্মিক চাকরী তার খসলো। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ছাঁটাই আরম্ভ হয়েছে এবং একদিন মেঘাচ্ছন্ন মনে শহীদ আবিষ্কার করলো নিজের সম্বন্ধে নির্বিঘ্ন হবার অবলম্বনটি তার আর নেই। এই তিন বছর ধরে তার মনে কেমন একটা ধারণা জন্মে গেছলো যে এরকমই চিরকাল চলবে। এর কোনো ব্যতিক্রম অভাবনীয়। তাই সহসা বাদশাহ থেকে প্রায় রাস্তার ফকির হয়ে যাওয়ায় চারদিকে বেচারা অন্ধকার দেখে। পিতৃবন্ধুর আশ্রয়ে অতএব আবার ফিরে আসতে হয়।

লোক তিনি সদাশয়। আদর করে বন্ধু-তনয়কে নিজের কাছে রাখেন এবং তার জন্য তিনি কিছু করতে পারেন কিনা প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন। জবাবে অবশ্য শহীদ সব সময় 'না' বলে। খাওয়াচ্ছেন, থাকতে দিচ্ছেন, এই যথেষ্ট—এর বেশী প্রত্যাশা করে কোন্ মূঢ়! গত তিন বছর এক পয়সাও জমানো শহীদ দরকার মনে করে নি। খালি হাতে কলকাতার প্রলোভনের সঙ্গে যুঝতে থাকা সে কি ছুঁচো-নিঙড়ানো কাজ, শহীদ নতুন করে বুঝতে পারে।

খোদা আবার মুখ তুলে চান। এক সওদাগরের অফিসে কাজের খোঁজে গিয়ে তখুনি সে এক চাকরি পেয়ে যায়। আরম্ভেতেই মাইনে তিন শ' টাকা। নসীবের এমন ঘোরফের দেখে তাজ্জব বনে যায় শহীদ, তবে তাজ্জবের ভাব চাকরী গ্রহণ না করতে অবশ্য প্ররোচনা দেয় না।

তাই আবার শহীদকে করিম বক্স এবং ব্রাইট এ্যাণ্ড ম্যাকিভর-এ আনাগোনা করতে দেখা যায়, মেয়ে বন্ধুও জুটে যায় বিনা প্রয়াসে; সকৌতুকা চৌরঙ্গী বিলাসিনীর সঙ্গে রাতের পরিচয় তার হয় ঘনিষ্ঠতর।

বেশ উন্মাদনা আছে এমন লাগাম ছাড়া জীবনে। টাকা যার আছে এমন উদ্দাম জীবন তাকে মানায়ও বেশ। দুঃখের বিলাসিতায় তারাই পরিপূর্ণরূপে নিমজ্জিত হতে পারে অভাবের তাড়নায় যারা হাঁসফাঁস করে মরে না। তাই নিজেকে বেশ ভাগ্যবান মনে করে শহীদ এবং কোনো কিছুরই প্রতি তার কোনো বিক্ষোভ থাকে না। অবসর-ক্ষণকে রসঘন ও মনোলোভা করবার কৌশল তার জানা আছে। যৌবনের ক্ষিপ্র ঘোড়ায় চড়ে কোন্‌দিকে ধাওয়া করতে হয় সেটা তার এখন আর অপরিজ্ঞাত নয়। মাঝে মাঝে মন যে খারাপ না করে এমন নয়। বিভোল বাতাস যখন বয় বা আকাশে পৃথিবীর সঙ্গে চক্রান্ত করে চাঁদ যখন হাসে, তখন বিচিত্র বাসনায় হৃদয় গুমরে মরে। তবে তা সাময়িক। বেশীক্ষণের জন্য তাই মনে কোনো আক্ষেপ থাকে না।

একদিন শহীদকে অফিসের ম্যানেজার সাহেব তলব করেন। উর্ধ্বতন কর্মচারীর ডাক শুনে ক্ষণিকের তরে শহীদের মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কিসের জন্য এই ডাক। আবার সেই ছাঁটাই নাকি। নিমেষে শহীদ শঙ্কিত ও ভাবনাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য এ-কথাও সে ভাবে কর্মচারী হিসেবে এর মধ্যেই তার বেশ সুখ্যাতি হয়েছে। অতএব তাকে তাড়াবার সম্ভাবনা, ছয় মাসও যার চাকুরীর মেয়াদ হয়নি, প্রবল নয়। আন্দাজে স্থানভ্রষ্ট, ঈষৎ জমকালো টাইকে আঙুল দিয়ে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে সে ম্যানেজার সাহেবের কামরায় ঢুকে পড়ে।

বেশ হাসি খুসী ভাব। সব সময় যেন সূর্যালোক ছিতরিয়ে বেড়াচ্ছেন। বয়স আন্দাজ চল্লিশ নাগাদ হবে। মুখে এক অর্ধদগ্ধ চুরুট। চেহারা কোনো কুমারীর চিত্ত জয় করার মতো নয়। দরাজ হেসে ম্যানেজার সাহেব বলেন: বসুন শহীদ সাহেব।

বিনা সঙ্কোচে শহীদ নিজের দিকে এক চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে।

—বাস্তবিকই আপনা দর মতো শিক্ষিত ইয়ংম্যানরা ব্যবসার দিকে মন দিয়েছে দেশের ভবিষ্য্তের পক্ষে এ এক খুব আনন্দের কথা।

নীরব থাকাই শহীদ আপাততঃ শ্রেয় মনে করে। কারণ, সে নিশ্চিত জানে, শুধু এই কথা বলার জন্যই ম্যানেজার সাহেব তাকে ডেকে পাঠান নি।

অর্ধদগ্ধ চুরুটে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতে এক টান দিয়ে, এ্যাসট্রেতে ছাই ফেলে বাঁ হাতের মাঝখানের দু'আঙুলের ফাঁকে তা ধরে তিনি সুমিষ্ট হেসে আবার বলেন: আমরা বাঙালী মুসলমান যুবক চাই, অথচ তাঁদের টান দেখা যায় সরকারী চাকুরীর দিকে—তা কেরানীর হলেও কুছপরোয়া নেই—(এখানে ভারিক্কী ধরনের ম্যানেজার সাহেব একটু হাসেন এবং শহীদ তাতে যোগ না দেওয়াতে মনে মনে কিছু ক্ষুব্ধ হয়ে ঠোঁটের কোণে ধীরে ধীরে হাসিকে মিলিয়ে আনেন) আপনাদের মতো বুদ্ধিমান সুশিক্ষিত বাঙালী মুসলমান ইয়ংম্যানরা (শহীদ ভাবে ম্যানেজার সাহেবের বিশেষণের ধাক্কা কি আর শেষ হবে না) ব্যবসার দিকে মন দিয়েছেন দেখে আমাদের কত আনন্দ হয়। ব্যবসা ছাড়া দেশের কি কোনো উন্নতি হয়—আপনিই বলুন ?

নীরব সমর্থনে শহীদ শুধু মাথা নাড়ে।

আপনি হয়তো ভাবছেন, খালি এসব কথা বলবার জন্যই কি আপনাকে ডেকেছি—জ্ঞানী মনস্তত্ত্ববিদের ঢঙে এবার ম্যানেজার সাহেব কথা বলেন—না তা নয়, আমরা পাঞ্জাবে এক ব্রাঞ্চ খুলছি, সেখানে একজন সুযোগ্য লোকের দরকার ; এই কয় মাসেই আপনি যে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা দেখে আমাদের সকলের ধারণা হয়েছে যে সে কাজের জন্য আপনার চেয়ে আর ভালো লোক পাওয়া যাবে না। আপনি কি যেতে রাজী আছেন ?

শহীদ এইবার নিজে এক প্রশ্ন করে: পাঞ্জাবের কোথায় ব্রাঞ্চ খুলছেন জানতে পারি কি?

লাহোর, ভারী চমৎকার জায়গা, দেখবেন কয়েক মাসের ভেতরই চেহারা ফিরে যাবে, আর ফল টলও অজস্র খেতে পারবেন। প্রথম প্রথম অবশ্য অনেক কাজেরই ধকল আপনাকে পোহাতে হবে তবে আপনার মতো কর্মী ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি লোকের পক্ষে সেগুলো সামলানো মোটেই কঠিন হবে না—আপনার এই কয়দিনের কাজ দেখেই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

লাহোর, তা মন্দ কি—মনে মনে শহীদ ভাবে। নতুন দেশ দেখাও হবে, ফল খাওয়াও হবে এবং আরও অনেক মেওয়ার সন্ধান পাওয়া যাবে হয়তো। খালি আবহাওয়ার আনুকূল্যের জন্যই তার চেহারা ফিরবে কিনা, না আরও কোনো জোরালো কারণ আছে—সে কথাও বিবেচনা করে দেখে শহীদ। আর সে তো একা। বলতে গেলে বনের পাখীর মতো মুক্ত। লাহোরে যেতে তার আর কি আপত্তি হতে পারে! কলকাতায় অবশ্য অনেক টান আছে তবে লাহোরের টান যে তার চেয়ে কম হবে এমন মনে করবারই বা কি কারণ আছে!

অতএব প্রচুর শুকরিয়া জানিয়ে ম্যানেজার সাহেবের প্রস্তাবে শহীদ সম্মত হয়ে যায়। সে নতুন চাকরীতে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেবে এবং অচিরেই আরও উন্নতি করবে—সহাস্যমুখে সে ভবিষ্যদ্বাণী করে ম্যানেজার সাহেব তাকে বিদায় দেন।

সহসা পাঞ্জাবে বিরাটাকারে গোলমাল লেগে যাওয়ায় ম্যানেজার সাহেব আর একদিন শহীদকে ডেকে বললেন যে আপাততঃ তাঁদের লাহোর শাখায় লোকের কোনো দরকার হবে না। অবস্থা আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে এলে শহীদকে সেখানে পাঠাবার কথা তাঁরা পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এখন এখানেই সে কাজ করতে থাকুক; এখানেও উন্নতির দ্বার খোলা।

লাহোরে যাওয়া হলো না ভেবে শহীদ অবশ্য তেমন দুঃখিত বোধ করলো না। নিজের দেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় গোলমালের মধ্যে গিয়ে পড়া কোনো কাজের কথা নয়। এখানেই সে বহাল তবিয়তে আছে; লাহোরের মেওয়া না হয় অনাস্বাদিতই থাকলো এখন। নিশীথ কলকাতার অন্তঃস্থল বের করবার প্রয়াসে আবার সে মেতে ওঠে।

চমক খায় শহীদ যখন একদিন অফিসে গিয়ে দেখে যে তার কামরার অর্ধেক জায়গা জুড়ে নতুন-আনা টেবিল-চেয়ার সহ একজন বছর পঁচিশের যুবতী বিরাজ করছে। তাক্ লেগে যায় তার যখন সে আবিষ্কার করে মেয়েটি খালি স্বাস্থ্যবতী নয় দেখতেও মোটামুটি ভালো। কেমন যেন এক তাজা অবিকৃত স্নিগ্ধতার ভাব আছে, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অভি-ব্যক্তি জুড়ে কাছে-এসোনা ঢঙও সুপরিস্ফুট। প্রথমে তো ব্যাপার ঠাহর করেই পায় না শহীদ। বিস্ময়ের দাপটে তার মুখ থেকে বেরিয়েই যায়—আপনার নামটা জানতে পারি কি এবং কি উপলক্ষে আপনার এখানে আসা?

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে শহীদের দিকে চেয়ে তীব্র বিরক্তির স্বরে মেয়েটি শুধু বলে; এতো কথা জানতে আগ্রহ কেন, নিজের কাজ করে যান না।

ঈষৎ অপ্রস্তুত বোধ করে শহীদ। চট্ করে কিন্তু সামলিয়ে নিয়ে বলে: ও কয়টা কথা জিজ্ঞেস করাও তো এখন আমার কাজের মধ্যে এসে পড়েছে দেখছি; আমার কামরা এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে আধা-আধি ভাগ করে নেওয়ার পেছনে কি কারণ আছে তা জানতে চাওয়া এমন কি অপরাধ।

কারও কামরা আধাআধিভাবে ভাগ করে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠছে না, মাঝখানে কালকেই একটা পর্দা পড়বে—নতুন-আসা মেয়ে অকুণ্ঠিত ভঙ্গীতে গড়বড় করে বলে যায়—আর আগমনের রহস্য ভেদ করবার আগ্রহ কোনো ভদ্রলোকের যদি এতোই প্রবল হয়ে থাকে তো ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে দেখা করাই প্রশস্ত বলে আমি মনে করি।

কোনোরকম পরিচয় না থাকলেও তাকে সম্বোধন করে মেয়েটি যে এতো চোখা-চোখা কথা অনায়াসে বলে গেলো সে কথা ভেবে নতুনভাবে তাজ্জব বনে যায় শহীদ। অনেকটা সম্মোহিতের মতো বলে : ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে না হয় অন্যদিন দেখা করা যাবে, আপনার সঙ্গে যে পরিচয় হলো সেটাই আজকের বড় লাভ।

জোর করে কথা বলাকে পরিচয় হওয়া বলে না—নবাগতা মনে করিয়ে দেয় এবং শহীদের সঙ্গে এখন আর কোনো কথা বলার সম্ভাবনা নেই এমন এক সুনিশ্চিত ঢঙে নিজের টেবিল সাজানোর দিকে মন দেয়।

ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে দেখা না করেও শহীদ জানতে পারলো মেয়েটি তাদের অফিসে নতুনতম আমদানী। তবু তার কাজ ঠিক কি, কেউ ভরসার সঙ্গে বলতে পারলো না। কেউ বলে : জানেন না মশায়, ম্যানেজার সাহেবের 'কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল' ক্লার্ক। কথার শেষে তার চোখের তারাতে দুষ্টুমির ঝিলিক্ খেলে যায়।

অপর একজন টিপ্পনী কাটে, এখন আর কাউকে ম্যানেজার সাহেব নিজের 'কন্‌ফিডেন্‌স'-এ নেবেন না।

আপনি হলেই কি আর নিতেন মশায়। তৃতীয় জনের অপ্রত্যাশিত মন্তব্য।

সকলেই হেসে ওঠে।

শহীদ একবার ভাবে, মেয়েটিকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে দেখলেই হয়। তবে মেয়েটির হাবভাব দেখে ততটা অগ্রসর হতে সাহস করে না। যদি হঠাৎ তুমুল চীৎকার করে সারা অফিস তোলপাড় করে বসে। ও মেয়ের পক্ষে সব-কিছুই সম্ভব। তার কথার তুবড়ির সামনে দাঁড়ায় এমন সাধ্য কোন্ পুরুষের ?

খুব কাছাকাছি বসে তারা দু'জনে কাজ করলেও পরস্পরের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হয় না। দু'একবার শহীদ নিজে চেষ্টা করে অবশ্য দেখেছে, ফলে অন্য পক্ষের নীরবতার ঠোকর খেয়েই শুধু ফিরে আসতে

হয়েছে। মেয়েটি যেন মনে করে শহীদের উদ্দেশ্য মহৎ নয়; নীরবতার বর্ম দিয়ে নিজেকে আগ্‌লে রাখবার তাই তার এতো অক্লান্ত প্রয়াস। মনে মনে নবাগতার ওপর শহীদ ভয়ানক চটে।

ওদিকে আবার ম্যানেজার সাহেব, কি বিচিত্র কারণে কে জানে, শহীদের ওপর বিরক্ত হতে আরম্ভ করেছেন। তার বিরক্তির সহসা কি কারণ ঘটলো, শহীদ আঁচ করতে পারে না। কাজে সে কদাপি গাফিলতি করে না; আজকাল বরং আগের চেয়ে একটু বেশীই খাটছে। তবুও ম্যানেজার সাহেব কেন যে তার ওপর ক্রমে ক্রমে বেশী বিরক্ত হতে চলেছেন, সে-রহস্য ভেদ করা শহীদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। আজকাল তার প্রায় প্রত্যেক কাজেই তিনি খুঁত ধরতে আরম্ভ করেছেন এবং মিষ্টি কথার পেছনে তার জ্বালা, কি কারণে উদ্ভূত তিনিই খালি জানেন, বেশ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়ে ওঠে।

একদিন তিনি শহীদের কয়েকটা ফাইল নিয়ে নিজের অফিসে আসতে বলেন। তাঁর কামরায় প্রবেশ করে তাঁকে আদাব করবার পর সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে।

ম্যানেজার সাহেব তাঁর দুর্বল হাসি হেসে অথচ কণ্ঠে আশ্চর্য বিরক্তি সঞ্চারিত করে বলেন: ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সঙ্গে যখন দেখা করতে আসেন তখন চেয়ারে বসবার আগে তাঁর অনুমতি নেওয়ার নীতি প্রায় প্রত্যেক অফিসেই প্রচলিত। ক্ষুব্ধ স্বরে শহীদ জবাব দেয়: এর আগে তো এমনভাবে চেয়ারে বসাতে আপত্তি করেন নি, এখন থেকে না হয় আপনার অনুমতি নিয়েই বসবো। কথা শেষে নাটকীয় ভঙ্গীতে শহীদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

তাতে ম্যানেজার সাহেবের মেজাজ ঠাণ্ডার দিকে যায় না, তিনি বলেন: আপনি দেখছি নিজের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করে আমার ব্যবহারের বৈসাদৃশ্য আমাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন।

আপনাকে বিচলিত করবার কোনো সঙ্কল্প আমার ছিলো না। যেমন

নাটকীয় ছন্দে সে চেয়ার ছেড়ে উঠেছিলো ততোধিক থিয়েটারী ভঙ্গীতে শহীদ আবার চেয়ারে বসে পড়ে।

কিসের জন্ত ম্যানেজার সাহেব ডেকেছিলেন সে কথা বোধ হয় বেদোর ভুলে গিয়ে তিনি চাপা রাগকে তেমন ঢাকা না রেখে বলেন: আচ্ছা এবার আপনি আসতে পারেন, তবে কাজের দিকে আর একটু বেশী মন দিলে ভালো হয়; আজকাল কাজের চেয়ে অন্তদিকেই যেন আপনার মন বেশী এমন একটা ধারণা গত কয়দিন ধরে আমার মনে ঘোরাফেরা করছে।

শহীদ স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেই বসে: তেমন কয়েকটা উদাহরণ দেবেন কি, আর কোন্ কাজে আমার ত্রুটি থেকে গেছে সেটাও জানতে পারলে একটু সুবিধে হতো।

হঠাৎ মিনমিনে বিড়াল হয়ে ম্যানেজার সাহেব সুর নরম করে আনেন: আরে আপনি কথাগুলোকে ওভাবে নিচ্ছেন কেন, আপনাদের এ বয়সে দু'একটা ভুলচুক হবেই, তবে আমাদের কর্তব্যও তো আমাদের করতে হবে, তাই আপনাকে ডাকা। মনে নেবেন না এসব কথা, আমাকে বরাবরই আপনি নিজের বড় ভাইয়ের মতোই কল্যাণকামী মনে করবেন।

ম্যানেজার সাহেবের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর বিচিত্র আচরণ ও ততোধিক বিচিত্র কথাবার্তার যথার্থ কারণ কি তা অনেকক্ষণ ভেবে বের করবার চেষ্টা করে শহীদ। তবে কোনো কূলকিনারা পায় না। নিজের কামরায় ফিরে এসে পর্দার ফাঁক দিয়ে শহীদ দেখে, তার বিব্রত বিহ্বলিত ভাব লক্ষ্য করে নতুন-আসা মেয়েটা মুচকি মুচকি হাসছে। শহীদের মেজাজ তাতে আরও খাট্টা হয়ে যায়। এক সময় ভাবে: দুত্তোর তোর চাকরী, কালকেই ইস্তফা দিয়ে দেওয়া যাক। তবে ইস্তফা দেওয়ার পর কি করবে সে কথা ভেবে শহীদের মনোভাব আবার বদলে যায়। আজকালকার দিনে চাকরী ছাড়া মানে আবার অসচ্ছলতার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া। সাধ করে তা বরণ করে এমন কি লাভ।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। নতুন-আসা মেয়েটা এখন আর ততটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে না। বরং শহীদের সঙ্গে আলাপ করতেই তার আগ্রহ দেখা যায়। মুখে সম্প্রতি তার এক দুশ্চিন্তার ছাপ। একদিন তো আচানক শহীদের কামরায় এসে মেয়েটি তার কাছ থেকে ব্লটিং পেপারই চেয়ে বসে। যত বেশী বিস্মিত হয় শহীদ খুশী হয় ততোধিক। মুখে শুধু বলে: আমি কি নেকড়ে বাঘ যে আমায় এতদিন আপনি এড়িয়ে চলেছিলেন।

পরখ করছিলাম এতদিন আপনাকে—মেয়েটি গভীর দুষ্টমীর ভঙ্গীতে বলতে থাকে—এখন বুঝতে পেরেছি যে তেমন ভয় পাবার মতো জীব আপনি নন।

মেয়েটির কথার ধরনে না হেসে পারে না শহীদ।

অত নিশ্চিত হবেন না। কোন্ লোক কি রকমের—এত তাড়াতাড়ি সব সময় ঠাহর করা যায় না—শহীদও রসিকতার ধরন বজায় রাখে।

নিশ্চিত আর হচ্ছি কোথায়, নিশ্চিত হতে পারি কিনা বরং সে পরীক্ষাই শুরু হলো এখন। মেয়েটিকে কথায় হারানো মুস্কিল।

দেখবেন পাশ নম্বর পাই যেন—শহীদ বলে এবং দুজনে একত্রে হেসে ওঠে।

এমন সময় সামনে দিয়ে ম্যানেজার সাহেব বাইরে চলে যান তাদের দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে। মেয়েটি ব্লটিং পেপার নিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে যায়; কাজে আবার মন বসাতে চেষ্টা করে শহীদ।

পরের দিন ম্যানেজার সাহেবের কামরায় আবার ডাক পড়ে শহীদের। ম্যানেজার সাহেবকে আদাব করার পর তিনি শহীদকে বসতে বলেন।

সিগারের অগ্রভাগে দাঁত দিয়ে চিরে কিছুক্ষণ তারিকী ধরনে নীরব থাকবার পর একটা ফাইল শহীদের দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত বলেন: পড়ে দেখুন এটা তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন আপনাকে আবার ডেকে পাঠিয়েছি।

ফাইল নিজের কাছে এনে শহীদ দেখে তাতে দু'টো চিঠি ; একটা তাদের অফিস থেকে লেখা আর একটা সে চিঠির জবাব। তাদের অফিস থেকে চিঠি লেখা হয়েছিলো সেটা পড়ে দেখবার পর সে বুঝতে পারে চিঠিটা তার নিজেরই রচনা। জবাবে যে চিঠি এসেছে তাতে শুধু এক লাইন লেখা : আপনাদের অফিসের এতো নম্বরের এতো তারিখের চিঠি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ইংরেজীতে লেখা।

শরমে মুখ কালো হয়ে যায় শহীদের। ইংরেজীতে তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি না থাকলেও সে কি করে যে এতো কয়টা মারাত্মক ভুল করতে পেরেছিলো তা সে বুঝতে পারছে না। সেই বিশেষ দিনে, বিশেষ ক্ষণে, এমন কি মতি-বিভ্রম হয়েছিলো তার, যে, সামান্য এক চিঠি লিখতে গিয়ে সে ইংরেজী ভাষার ওপর চেঙ্গিজ খাঁর মতো নিষ্ঠুর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিলো। নতুন-আসা মেয়ের কথা ভাবছিলো নাকি।

ম্যানেজার সাহেব সুবিধে পেয়ে জেঁকে বসেন : আমরা না হয় ইংরেজী তেমন শিখিনি, তবে আপনাদের মতো সুশিক্ষিত লোকের ইংরেজীর ওপর যদি এমন মন্তব্য শোনা যায় তবে আমাদের গতি হবে কি বলুন দেখি? আমি কয়দিন ধরে লক্ষ্য করছি—ভুল বুঝবেন না আমায়—কাজে আপনার এখানে কোনো কারণে মন বসছে না, দরকার যদি মনে করেন তেমন, কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে যেতে পারেন।

শহীদ জানায় : ছুটি নেবার মতো কোনো কারণ আপাততঃ সে দেখছে না।

তাহলে এক কাজ করুন, পাঞ্জাবের অবস্থা তো এখন অনেক ভালো হয়ে এসেছে, আপনি বরং আমাদের লাহোর ব্রাঞ্চ-এ চলে যান, নতুনভাবে নতুন উদ্যমে সেখানে কাজ করতে পারবেন।

শহীদ বলে : বেশ তাই হোক তাহলে ; লাহোর যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনার হামদরদীর জন্য শুকরিয়া।

না না, শুকরিয়া দেবার মতো কি কাজ করেছি আমি? আপনাদের

সকলের মঙ্গলই আমার কাম্য। ম্যানেজার সাহেব চুরুটে জোর টান দেন।

নিজের কামরায় ফিরে যাবার সময় শহীদ অবাক হয়ে ভাবে: তার দোষের কথা চেপে গিয়ে ম্যানেজার সাহেব তাকে লাহোর পাঠাবার জন্য হঠাৎ উৎসুক হয়ে উঠলেন কেন?

পরের দিন অফিস যখন ছুটি হয় হয় এমন সময় শহীদের কাছে এসে মেয়েটি বলে: আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা দরকারী কথা ছিলো।

আমার সঙ্গে?—অগাধ বিস্ময়ের ভঙ্গীতে শহীদ বলে।

কেন আপনার সঙ্গে কথা বলা কি দুনিয়ার এক অষ্টম আশ্চর্য যে অমন করে আকাশ-থেকে-পড়া মুখের ভাব করেছেন—মেয়েটি মধুর ভ্রূকুটি করে বলে।

আপনার আগেকার ভাব দেখে কখনও ভরসা হোত না যে আমার সঙ্গে কোনো দরকারি কথা বলতে আপনি কখনও সম্মত হতে পারেন।

আর কিছু না হোক, বিনয় আপনার আছে।

কথাটার গূঢ়ার্থ খেয়াল না করেই শহীদ বেশ প্রীত বোধ করে।

অফিস থেকে এসপ্ল্যানেড-এর দূরত্ব পোয়া মাইল খানেক হবে। সেটুকু পথ হেঁটে যাওয়াই তারা মনস্থ করে। এসপ্ল্যানেড থেকে উল্টো দিকের ট্রাম ধরবার সুবিধে।

মেয়েটি বলে: আপনাকে পরখ করবার পর এটুকু আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনাকে দিয়ে আমার কোনো অনিষ্ট অন্তত হবে না।

আমার সম্বন্ধে আপনার উঁচু ধারণার জন্য আপনাকে আমি খালি ধন্যবাদই জানাতে পারি।

আর কিছু না জানালেই খুশী হবো।—মেয়েটি বড় ভুখোড়।

আপনার দরকারী কথা বলবেন না—শেষের দিকে শহীদের স্বর নিজের অজ্ঞাতেই একটু কেঁপে যায়।

ম্যানেজার সাহেব সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ? মেয়েটির অতর্কিত প্রশ্ন।

লোক তো ভালোই দেখা যায়, ভারী মিষ্টি কথা, মোলায়েম ব্যবহার। —তার প্রতি ম্যানেজার সাহেবের রহস্যকর আচরণের কথা শহীদ তখনও ভুলতে পারে নি।

ভিজে বেড়ালটি যেমন হয়, না ?

ম্যানেজার সাহেবের ওপর আপনি দেখছি বেশ চটা।

কারণ থাকলেই লোকে চটে ; তিনি আমাকে ঠিক নিজের মেয়ের মতো দেখেন না।

অর্থাৎ ?—শহীদের কণ্ঠে ঘোর বিস্ময়।

এ-কথা বুঝতেও যদি আপনার কষ্ট হয় তবে তো আমি নাচার।

শহীদ চুপ করে কি ভাবতে থাকে।

আচ্ছা বলুন দেখি—মেয়েটি সহসা আড়ভাবে শহীদের দিকে সম্পূর্ণ চোখ তুলে বলে—আমাকে দেখতে কি খেলো মেয়ের মতো লাগে ?

তাই যদি লাগতো—শহীদ এবার বলে—তবে আপনার সঙ্গে এতো দেরী করে কি আলাপ হোত ?

ট্রাম আসে।

ট্রাম এসে পড়বার আগে মেয়েটি আবার এক অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করে : আপনাকে নাকি ম্যানেজার লাহোর পাঠাচ্ছেন ?

তা আপনি জানলেন কি করে ? শহীদের চোখ আবার বড় হয়ে যায়।

যেখান থেকেই জানি না কেন, সেটা এমন কিছু দরকারী জিনিস নয়, আপনি কিন্তু লাহোর যাবেন না। মেয়েটি ট্রামে উঠে পড়ে।

বিচিত্র আবেগের সম্মোহনে শহীদ কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

সে-রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত শহীদের ঘুম হয় না। ম্যানেজারের

আচরণ এখন তার কাছে আর ততটা দুর্বোধ্য মনে হয় না ; তবে মেয়েটির পরিবর্তন তার কাছে চমকপ্রদ মনে হয়। তার দিকে সহসা ঝুঁকে পড়বার কি কারণ ঘটলো মেয়েটির ; ম্যানেজারের বিরুদ্ধে তাকে উস্কানোই কি মেয়েটির একমাত্র সঙ্কল্প ? তাতে কার কি লাভ হবে। না······তবে সেটা অসম্ভব। বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে অবস্থাটা যা হোক !

পরের দিন অফিসে গিয়ে শহীদ আবিষ্কার করে মেয়েটি অনুপস্থিত। তাকে তার নিজের জায়গায় না দেখতে পেয়ে গভীর হতাশা বোধ করে শহীদ। অসুখ করলো নাকি, না চাকরীতে ইস্তফা দেওয়াই ঠিক করেছে ! দ্বিতীয়টা করলে বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েটির পক্ষ নিয়ে, দরকার হলে, শহীদ ম্যানেজারের সঙ্গে লড়তে রাজী আছে। একি ইয়ার্কী পেয়েছো নাকি। চাকরী দেবার অছিলায় একজনের সর্বনাশ করা। বেশী বেয়াড়াপানা করলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো না। তারপর চাকরী যায় যাক—কুছ পরওয়া নেই। তবে মেয়েটি তাকে সংগ্রাম করবার সুযোগ দিলেই হয়।

ম্যানেজার সাহেব একবার ডাকিয়ে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন : লাহোর যাওয়া সম্বন্ধে কি ঠিক করলেন ?

বাইরে কোনো রকম ভাবান্তর না দেখিয়ে শহীদ শুধু বলে : দু'এক সপ্তাহের ভেতরই আপনাকে নিশ্চিতভাবে জানাবো।

ম্যানেজারের কামরা থেকে বেরিয়ে এসে অবশ্য শহীদ মনে মনে তার নিপাত কামনা করে।—আমাকে লাহোর পাঠাবে না তুমি সেখানে যাবে, দেখা যাক্। অফিসের বড় কর্তা শহীদের খাতিরের লোক। তাঁর কাছে ম্যানেজার সাহেবের আসল মতলব ফাঁস করে দিলে বাছাধন মজা বুঝবেন তখন। এখন মেয়েটি তার পক্ষে থাকলেই হয়।

দু'তিন দিন পরে মেয়েটি আবার অফিসে এসে হাজির হয়। গত কয়দিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাওয়াতে তাকে শয্যাগত থাকতে হয়েছিলো।

মেয়েটি আজকে এসেছে বেশ কিছু সাজগোজ করে। তাকে দেখে শহীদের কেন জানি খুব মায়া হয়। আহা বেচারী, এর মধ্যে আবার জ্বরে পড়েছিলো।

বাসায় ফিরবার সময় আবার তু'জনে একত্র হয়।

এক কথা থেকে আর এক কথায় ঝট করে মেয়েটি আসে: আপনাকে ম্যানেজার লাহোর পাঠাতে চায় কেন জানেন?

কিছু না জানবার ভান করে, যদিও ব্যাপারটা এখন সে মোটামুটি আঁচ করতে পেরেছে, শহীদ বলে: না জানিনে তো!

—আপনি যেন কচি খোকা।

—সত্যি বলছি জানি না।

—আন্দাজ করুন তা হলে।

—সে ব্যাপারে আপনি কিছু সহায়তা করুন। তা না করে মেয়েটি হুড়-মুড়-করে এসে-পড়া ট্রামে উঠে পড়ে।

এমনি করেই কয়েকদিন যায়। মেয়েটির ওপর ম্যানেজার সাহেবের কুনজর পড়েছে। সিনেমা, নিউ মার্কেট যাবার প্রস্তাব করেন; শাড়ী কিনে দিতে চান; নেকলেস উপহার দেবেন বলে আশ্বাস দেন। মেয়েটির কাছে এসব কথা শুনে শহীদের রক্ত টগবগ করতে থাকে। বাপের বয়সী হয়ে তুমি একজন অসহায়া মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে চাও; তোমার প্রেমলিপ্সা, রাখো ঘোচাচ্ছি।

মেয়েটি প্রায় কাতর স্বরে শহীদকে জিজ্ঞেস করে: আপনি এমন অবস্থায় কি করতে উপদেশ দেন, চাকরী ছেড়ে দেবো?

—কালকে পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন, তারপর দরকার হলে চাকরী ছেড়ে দেবেন।

—কেন কালকে আপনি কি করবেন?

—সে কালকেই দেখবেন।

আগামী কাল আসে। নিজের টেবিলে বসে মেয়েটি কর্মরতা।

কিছুক্ষণ পরে চাপরাশী এসে সালাম দিয়ে বলে : মেম সাহেবকে বড় সাহেব সালাম দিয়েছেন। যাবার সময় মেয়েটি পেছন ঘুরে একবার শহীদের দিকে তাকিয়ে যায়। সে দৃষ্টির অর্থ : আবার কষ্টি-নষ্টি আরম্ভ হলো, শহীদ গতকালের প্রতিশ্রুতি যেন মনে রাখে।

রাগে শহীদ ফুলতে থাকে। আজকেই এর এক হেস্তনেস্ত করতে হবে। অসহায়া মেয়েকে কামান্ধ এক প্রৌঢ়ের কবলে ফেলে দিয়ে সে চুপ করে বসে থাকবে—এ কিছুতেই হতে পারে না। চাকরী করতে গিয়ে নিজেকে পশুর পর্যায়ে তো আর নামিয়ে আনা যায় না। কাজে তার মন বসে না। এতক্ষণ মেয়েটির সঙ্গে কি ন্যুইসেন্স আরম্ভ করে দিয়েছে চুরুট-খাওয়া ম্যানেজার, কে জানে। শহীদ তড়াক করে চেয়ার থেকে উঠে বসে। এই সুযোগে ম্যানেজারের কামরায় গিয়ে তাকে হাতে নাতে ধরা ; অছিলা থাকবে লাহোর যাওয়ার সম্মতি জ্ঞাপন। মেয়েটির সঙ্গে কোনো রকম আশোভন কিছু করবার চেষ্টা যদি ম্যানেজার করে, তবে আজকে শহীদ দেখে নেবে কি করে সে অক্ষত দেহে বাসায় ফিরে যায়।

ক্রোধোন্মত্ত ষাঁড়ের মতো ম্যানেজারের কামরায় হঠাৎ ঢুকে পড়ে শহীদ হতভম্ব হয়ে যায়। মেয়েটির গলাতে এক জমকালো সোনার হার দুলছে আর সেখানে দ্বিতীয় হার হয়ে জড়িয়ে আছে ম্যানেজারের দু'টি হাত। শহীদের অপ্রত্যাশিত প্রবেশে উভয়েই হচচকিয়ে যায়। মেয়েটি ছিটকে পড়ে, তার মুখটা সে-মুহূর্তে দেখবার মতো হয়েছিলো ; ম্যানেজারের হাত ক্ষিপ্রগতিতে যথাস্থানে ফিরে আসে।

ম্যানেজারকে শহীদ শুধু বলে : লাহোর যেতে আমি রাজি আছি সে কথা আপনাকে বলতে এসেছিলাম।

নিজের কামরায় ফিরে এসে টেবিলের ওপর কনুই রেখে দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে শহীদ অনেকক্ষণ বিহ্বলিতের মতো বসে থাকে। মণি পাওয়ার আশা নিয়ে গিয়ে সে ফিরে এসেছে মেকী সোনা নিয়ে।

দুয়ে একে তিন

মোনায়েম খান যখন শুনলো, সদর মহকুমা অফিসার করে শীগগিরই তাকে রাজশাহী বদলী করা হচ্ছে, তখন মনটা তার বড়ই খারাপ হয়ে গেলো। নিজে সে অবশ্য রাজশাহী দেখেনি, তবে উত্তর বাংলার এই শহর সম্বন্ধে বন্ধু-বান্ধবদের মুখে যা শুনেছে, তাতে করে রাজশাহী দেখবার কোনো সখ তার মনে জাগবার কথা নয়।

বন্ধু হেদায়েৎউল্লাহ্—আয়কর বিভাগে কাজ করতে করতে যে সমস্ত জিনিস, নিজের অলক্ষ্যেই বোধ হয় আয় কিম্বা করের দৃষ্টিভঙ্গীতে যাচাই করতে শিখেছে, বলে: এখন আর রাজশাহী গিয়ে কি করবে, আগে ছিলো সেখানে সব জিনিস সস্তা চর থেকে যখন প্রচুর শাক-শব্জী আসতো, সে-সব চর নাকি এখন হিন্দুস্থানের দখলে পড়ে গেছে।

—আচ্ছা জায়গাটা কি রকম? অনেকটা সংকোচের সঙ্গে মোনায়েম বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে যেন হেদায়েৎউল্লাহ্ না ঠাউরে বসে যে, মোনায়েম তার বন্ধুর মন্তব্যকে তত্টা গুরুত্ব দিলো না।

পচা, একবারে পচা, ধূলো ছাড়া ওখানে আর কিছু দেখতে পাবে না। হেদায়েৎউল্লাহ্‌র কথার ভঙ্গীতে রাজশাহীর প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা ফুটে ওঠে।

—শুনছি শহরটা নাকি পদ্মা নদীর ওপর? নিজের শঙ্কিত মনকে নিজেই কিছুটা যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে, এমন ধরনে মোনায়েম কথাগুলি মুখ থেকে বের করে।

—রাজশাহীকে শহর বলে শহর কথাটাকে আর হেয় কোরো না, আর পদ্মা নদী তো সেখানে বাঁজা, শুধু এক বর্ষাকাল ছাড়া।

—তুমি সেখানে কতদিন ছিলে? মোনায়েম জানতে চায়।

—বছর তিন তো হবেই, একদম বরবাদ গেছে সে সময়টা।

মোনায়েম প্রায় জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলো বন্ধুর সময়টা কি হিসেবে সেখানে বরবাদ গিয়েছিলো—আয়ের দিক থেকে না করের? হেদায়েৎ-উল্লাহ্, শোনা যায়, খুব 'পোকার' খেলে। তবে সে লোভটা সামলে নিয়ে শুধু বলে: যত খারাপ বলছো, তত খারাপ হয়তো হবে না। ওখানে সরকারী বড় একটা কলেজ আছে, শুনেছি, ইউনিভার্সিটিও নাকি শীগগির হচ্ছে। অন্ততঃ মনের খোরাক তো কিছু পাওয়া যাবে।

—যাও। গিয়ে দেখো। কিসের খোরাক পাও। হেদায়েৎউল্লাহ্ গভীর অর্থপূর্ণ মিচকি হেসে বলে।

স্টেশনে নামতেই তার আর্দালী রব্বানীর সঙ্গে দেখা হলো। তাকে এক ঝলক দেখে মোনায়েম-এর মনে হলো, সরকারী চাকরী করবার বয়স বোধ হয় তার আর নেই। তবে সেটা নতুন জায়গায় সপরিবারে আসবার প্রথম মুহূর্তেই এমন-কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয় যে তা নিয়ে মোনায়েমকে ভাবনাগ্রস্ত হয়ে পড়তে হবে।

রব্বানী বললো: হুজুর, বাইরে জীপ আছে, আপনাদের বাসাও সব ধুয়েপুছে রেখে এসেছি। আপনারা যান, মালি নিয়ে আমি পেছনে পেছনে আসছি।

প্রস্তাবটা মোনায়েম-এর বেশ মনঃপুত হলো—বউ, এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে জীপ-এর দিকে সে ত্বরিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো।

জীপ্ যখন চলা আরম্ভ করেছে তখন রাস্তা আর দু'দিকের ব্যাধি-গ্রস্ত ঝিমিয়ে-থাকা জঙ্গল দেখে মোনায়েম-এর মনটা একটু দমেই গেল। শহরের কাছাকাছি এসে রাস্তার খ্যাবড়ানো ধুলো-ভরা চেহারা দেখে,

আর ভাঙা ও পুরনো ও ধূলিস্নাত কয়েকটি দালানের ক্ষয়ে-যাওয়া অবস্থা লক্ষ্য করে মোনায়েম কিছুটা রগড় করে তার ছেলেকে বলে : কেমন সুন্দর শহর, না তারিক, চাটগাঁর চেয়েও ভালো।

ছেলে সাত বছরের হলেও বাপের রগড় করবার ধরনের সঙ্গে এরি মধ্যে পরিচিত, বেশ সায় দিয়ে এবং নিজের একটা তাল যোগ করে বলে : শুধু চাটগাঁ না আব্বা, ঢাকার চেয়েও ভালো। ছেলের সঙ্গে জীপ চালাতে চালাতে ড্রাইভারও ফিক করে হেসে দেয় এবং মেম সাহেব কি মনে করবেন, সে-কথা ভেবেই হয়তো আবার চুপ মেরে যায়।

মেয়েটি কিন্তু তাল-ছেঁড়া এক মন্তব্য করে বসে—এত ধুলো আর গন্ধ কেন আব্বা?

কাজ বুঝে নিতে ও এদিকে তারিকের মার ঘর গুছাতে কয়েকদিন গেল। মোনায়েম-এর অফিসে দু' এক জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তবে তাদেরকে উকিলদের সঙ্গে এত মাখামাখি করতে দেখা গেল যে তাদের সঙ্গে খুব বেশী অন্তরঙ্গ হবার মওকা বোধ হয় থাকবে না। বয়সে মোটামুটি নবীন হলেও, বিবেকটা মোনায়েম-এর অনেকটা প্রাচীনই থেকে গেছে। হাকিমদের সঙ্গে নিজের কোর্টের উকিলদের দহরম-মহরম সে একেবারেই প্রীতির চোখে দেখে না—এতে বাইরের লোকেরা কানা-ঘুষা করবার সুযোগ পায়।

মোটামুটি ভালো ক্লাব এখানে নাকি একটা আছে—বোয়ালিয়াতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে যে, 'রামী' আর বিলিয়ার্ডস ছাড়া কিছুই হয় না—যার কোনোটাতেই তার আগ্রহ নেই। বিকেলে টেনিস খেলা হয় বটে, তবে নিয়মিত নয়, কারণ খেলোয়াড়ের অভাব।

কলেজ ক্লাব-এও চেষ্টা করে দেখে। সেখানে ঢিমে আলোতে প্রচুর সোরগোলের ভেতর 'ব্রে' কিম্বা বিনা 'ষ্টেক'-এ ব্রীজ খেলা হয়, অতএব এমন কিছু আকর্ষণের ব্যাপার নয়।

তারিকের মা বলে এখানকার মেয়েদের ক্লাবে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু পরস্ত্রীর নির্ভেজাল নিন্দে। তাতে যোগ দিতে না পারলে এই ক্লাবের সদস্যাদের চোখে ঃ কি স্মার্ট হওয়া যায় না। তারিকের মা আরও বলেঃ থাক বাবা, আমার ঘর সংসারই ভালো, স্মার্ট হয়ে কাজ নেই।

অতএব স্বামী স্ত্রী (অবশ্য মোনায়েম তার অবসরক্ষণে) মিলে ছেলে আর মেয়েকে মানুষ করবার কাজে লেগে যায়। তা সত্ত্বেও মেয়ে খালেদা বাসার চারপাশের মাঠ-পুকুরে ঘুরে নিজেকে ধুলো কাদায় লেপে দেয় আর তারিক পরের জমিন-এ গিয়ে সেখানে বেশ কিছু তোলপাড় করে এসে মার কাছে তিরস্কৃত হয়ে মুখ বেঁকিয়ে শুধায়ঃ কি বলছো গো?

তাই স্বামী স্ত্রী ঠিক করে, সঙ্গে সঙ্গে বাগান করবার চেষ্টা করে দেখা যাক। তাতে খালেদা ও তারিকের পরিষ্কার থাকবার খায়েশ জাগে কি না।

অবশ্য স্বামী স্ত্রী দু'জনেরই কথা বলবার লোক জুটে যায়। রব্বানী কাজ সেরে রোজ একবার, অসুস্থ না হলে, তার হুজুরের এখানে আসবেই আর হরেক রকম গল্প করে যাবে। তার মাকে রোজ একবার বলা চাই-ই ঃ হুজুরের মতো লোক হয় না মা। খোদা আমাদের উপর অনেক মেহেরবান বলে এরকম একজন নরম-দিল লোক পাঠিয়েছে।

কথাটা যথারীতি মোনায়েমের কানে যায়।—নরম-দিল বলেই তো কর্তাদের কাছে তেমন কদর নেই, তারা বলে এরকম লোক নিয়ে হাকিমের গরম কাজ কি করে হবে।

—নরম তুমি বাইরের লোকদের কাছে হতে পারো। কিন্তু একজনের কাছে গরম হতে তো তোমার বাধে না। চটুল পরিহাস করে তারিকের মা বলে।

—সেখানে একটু গরম না হলে যে বড় বেশী নরম হয়ে যাওয়ার ভয়—আজকালকার প্রগতিবাদিনীরা যা সব করা আরম্ভ করেছে।

মোনায়েম-এর কথার ধরনে সুখী স্বামীর মেষের মতো নরম ধরন কিছুটা তার অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে আসে।

রব্বানীকে মোনায়েম জিজ্ঞেস করে: তোমার বয়স কত হবে?

—তা'হুজুর ষাট পেরিয়ে গেছে।

—ষাট পেরিয়ে গেছে। তবে সরকারী চাকরী করছো কি করে?

—আমরা সব মুর্‌খু মানুষ হুজুর। আমার চাচা বয়স লিখাতে গিয়ে আট বছর কমিয়ে ফেলেছিলো। রব্বানীর ঈষৎ ঘোলাটে চোখে কিসের যেন এক ঝিলিক্ খেলে যায়।

—কতদিন চাকরী করছো?

—তা হুজুর অনেকদিন হবে। পঞ্চম জর্জ যখন দিল্লীতে দরবার করে, তখন দিল্লীতে গিয়েছিলাম; সেখান থেকে কোলকাতায় ফিরে এসে চাকরীতে ঢুকলাম।

—দিল্লীর দরবার তুমি দেখেছো। তাজ্জব হওয়ার ধরন দেখিয়ে মোনায়েম জিজ্ঞেস করে। দরবারটা কেমন হয়েছিলো?

—সে হুজুর আমাদের মতো মুর্‌খু মানুষ বলতে পারবে না। তবে শান হয়েছিলো বটে। আমি একটা পেতলের মেডেলও পেয়েছিলাম।

—সে মেডেলটা আছে এখনও?

কিছুটা তৃপ্তির হাসি হেসে এবং কিছুটা লজ্জার ভঙ্গীতে রব্বানী বলে —আছে হুজুর। বউ-এর গয়নার বাক্সে।

—তা দিল্লীতে আর কি কি দেখেছিলে?

—দেইখছিনু ওই যে কি বলে দিওয়ান খাশ আর বেগমরা যেখানে গোসল করতো, আর হ্যাঁ মুতি মসজিদ।

আচমকা মোনায়েম জিজ্ঞেস করে: কোলকাতা কেমন লাগে তোমার?

মুহূর্তের দ্বিধা না করে, জিহ্বার সঙ্গে সামনের দিকের নীচের মাড়ির এক নিপুণ সংযোগ ঘটিয়ে (যেন কোলকাতার অতীত স্মৃতির রস সে

নতুন করে আস্বাদন করছে) রব্বানী বলে : তা শহর বলতে কোলকাতা হুজুর। এমন শহর আর দেখিনি—তারপর মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে, যেন তুলনাটা করতে সে বেশ শরম পাচ্ছে, বলে—কোলকাতার শহরে রাজশাহীকে যেন পল্লীগাঁয়ের মতো মনে হয়, হুজুর।

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে মোনায়েম জিজ্ঞেস করে : আচ্ছা, তোমার এখন কোনো সখ আছে রব্বানী ?

—একটা আছে হুজুর। কিছুটা অসহায়ভাব রব্বানীর কথায়।

—কি ?

—মরবার আগে একবার পশ্চিম যাবার ইচ্ছে আছে হুজুর।

বেশ আগ্রহান্বিত এবং কিছুটা তাজ্জব হয়ে মোনায়েম আবা জিজ্ঞেস করে : পশ্চিম মানে বিলেতে নাকি ?

—না হুজুর, বিলেত আমাদের মতো মুর্‌খু লোক আর কি করতে যাবে, হজ্ব করতে যাবো হুজুর, মক্কা মোয়াজ্জেমা আর মদিনা শরীফে।

—টাকা আছে ?

—কিছু কিছু জমাচ্ছি হুজুর। আর বাকীটা অফিসের লোকেরা দেবে। সরল বিশ্বাসের ভঙ্গীতে রব্বানী কথাগুলি বলে।

—অফিসের লোকরা কথা দিয়েছে যে দেবে ? মোনায়েম জিজ্ঞেস করে।

—তা দেবে হুজুর। এই অফিসে তো অনেকদিন কাটিয়ে দিলাম। অফিসের লোকরা আমায় চেনে।

চিনলেই হলো—এই কথা ভেবে মোনায়েম সেদিনকার মতো রব্বানীর সঙ্গে কথোপকথন শেষ করে।

ওদিকে তারিকের মা বুড়ী একটা ঠিকে ঝির সঙ্গে কথা চালাচ্ছিলো। ফয়সলা করবার ধরনে তাকে সম্বোধন করে বললো : তোমার কাজ হবে বাসন ধোওয়া, কাপড় কাচা, মশলা পেষা আর রোজ কুঁয়ো থেকে বড়

বালতিতে দু'বালতি করে পানি তোলা, পারবে তো? বুড়ী মাথা নাড়ায় আর মুখে বলে: পারবো।

—এইসব কাজ করা তোমার শরীরে কুলাবে তো? তারিকের মার স্বরে কিছুটা সংশয়।

—তা কুলোবে না কেন, আমার তো কোনো ব্যামো নেই মা। বুড়ী জিনিসটাকে একেবারে সহজ করে দেয়।

—মাইনে কতো নেবে?

—দিওনি বুঝেসুঝে, তবে যদি পারো, তোমার একটা পুরোনো কাপড় দিও পরে, মা। বুড়ীর পরনে যে শাড়ীটা, তাতে তার আব্রু আর রক্ষা হয় না।

—তা পরে দেখা যাবে। কিন্তু মাইনে আমি পাঁচ টাকার বেশী দিতে পারবো না, নাস্তা আর দুপুরের খাওয়া পাবে।

—পাঁচ টাকাই বেশী। আর এক জায়গায় যেখানে ঠিকে কাজ করি তারা তো তিন টাকা দেয়।

বুড়ীর জওয়াব শুনে তার সম্বন্ধে তারিকের মার কৌতূহল দেখা দেয় আর কিছুটা দরদও। আজকালকার দিনে এতো সহজে তুষ্ট হতে কাউকে বড় একটা দেখা যায় না।

পরের দিন ভোরে একটা মাঝবয়সী মেয়ে এসে কুঁয়ো থেকে পানি তুলে আর ঝাসন-কাসন মেজে দিয়ে যায়। বুড়ীর মেয়ে। তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে বছর আটেক হলো বিধবা হয়েছে। পাশের বাড়ীতে এক উকিলের ওখানে কাজ করে। অনেকদিন ধরে আছে—খাওয়া-দাওয়া পায়, মাইনে আট টাকা, বছরে একটা শাড়ী।

যাবার সময় বলে: মা একটু পরে আসবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়ী এসে রান্নাবান্নার কাজে লেগে যায়। কাজ করতে একটু সময় নেয় বটে। তবে তার কাজটা, তারিকের মা খুশী হয়ে লক্ষ্য করে, বেশ পরিষ্কার।

টিমে তালে বুড়ী বেশ গল্পও করতে পারে এবং তারিকের মার কাছ থেকে তার বাপ-এর ও শ্বশুর বাড়ীর সব খবর এক এক করে বের করে নেয়। নিজের সম্বন্ধে বলে: দুটো ছেলে ও এক মেয়ে আছে। এক ছেলে টমটম চালায়। বড়টা নাকি দজ্জাল। ছোটোটা নাকি বোকা হয়েছে—মুটের কাজ করে। ছোটোটাই মাকে টানে বেশী। বড় ছেলে ও মেয়ে নাকি মা অসুখে পড়লে বা বাধ্য হয়ে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলে তাকে খেতে দিতে চায় না তখন ছোটো ছেলে মাকে দু'চার আনা পয়সা রোজ দিয়ে যায়। তা মাঝে মাঝে তাকে খেতে না দিলেও দু'জনকেই তো সে পেটে ধরেছে—তাদের উপর রাগ করে থাকতে পারে না। নাড়ীর টান বড় টান।

এমন সময় তারিক 'ব্লেড' দিয়ে কেমন করে নিজের আঙুল কেটে মায়ের সামনে এসে হাজির। কাঁদলো না একটুকুও, শুধু নিরাভরণ ভঙ্গীতে বললো: আঙুল থেকে রক্ত বেরুচ্ছে।

মা চিলবিলিয়ে ওঠে: তোর দুষ্টুমির জ্বালায় আর পারি না বাঁদর কোথাকার। দেবো একদিন এমন মার।

—তা মার পরে দিওনে মা। এখন কাটা আঙুলে গাঁদা পাতা একটু পিষে লাগিয়ে দাও। বলে বুড়ী নিজেই গাঁদা গাছ থেকে কয়েকটা পাতা আনতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

তবে তারিকের মা ছেলের কাটা আঙুলে গাঁদা পাতা দিবার পক্ষপাতী নয়। সে তারিককে সঙ্গে হেঁচড়ে টেনে 'ডেটল'-এর খোঁজে গেলো।

ওদিকে রব্বানী কয়েকদিন বিছানায় পড়ে থাকলো। তার বুকের বাঁ দিকে নাকি বেশ ব্যথা আছে। মোনায়েম তার পরিচিত এক ডাক্তারকে রব্বানীকে দেখতে পাঠালো। ডাক্তার বললো: হার্টের অসুখ; বয়স হয়েছে, কোন্ দিন কি হয় কিছু বলা যায় না।

তিন চারদিনের মধ্যেই রব্বানী কিন্তু অফিসে হাজিরা দিলো; সেখান থেকে বিকেলে মোনায়েমের বাসায় গেলো।

—শরীর এখন কেমন ? মোনায়েম জিজ্ঞেস করে।

—ভত যুতের নয় হুজুর, তবে আগের চেয়ে ভালো।

—দেখাশুনো করতো কে ?

—আমার পরিবার, আর ছেলেও ইনজেকশান দিতে আসতো।

—তোমার ছেলে ডাক্তার নাকি ?

—না হুজুর কম্পাউণ্ডার, ছেলে তো ওই আমার একটি। শেষের দিকে রব্বানীর গলার স্বর একটু কাতর হয়ে আসে।

—ছেলে তোমাকে দেখাশুনো করে না ?

—আগে করতো হুজুর, তবে বিয়ে করার পর বউয়ের পরামর্শে ওই যে আলাদা হলো, তখন থেকে তেমন আর খোঁজ করে না। নাতী নাতনীরা দেখা করতে এলেও বউমা সেটা পছন্দ করে না, বলে আমার বাসায় নাকি আসতে নেই······চাপরাশীর কাজ করি কিনা হুজুর!

রব্বানীর দিকে মোনায়েম নতুন আগ্রহের দৃষ্টিতে চায়। সরল-মনা ষাট বছরের এই বুড়ো সংসারের আঁকা-বাঁকা জালে আটকা পড়েও নিজের মনে কোনো বিদ্বেষ আসতে দেয়নি।

রব্বানী কিছুটা ইতস্ততঃ করে বলে : হুজুর যদি ভরসা দেন, একটা দরবার পেশ করি।

—কি, বলো। প্রসন্ন স্বরে মোনায়েম বলে।

আমি হুজুর অফিসে একটা দরখাস্ত দিতে চাই, ওখানকার কেরানীরা আমি হজ্ব করতে যাবো শুনে বলেছে, সকলে মিলে চাঁদা দেবে। আপনি যদি দরখাস্তে একটা সই করে দেন হুজুর, তবে গরীবের বড় উপকার করা হয়।

কিছুক্ষণ কি ভেবে মোনায়েম বলে : আচ্ছা কাউকে দিয়ে দরখাস্তটা লিখিয়ে নিও, আমি একটা সই করে দেবো।

এদিকে মোনায়েমের নিজের একটা বিপর্যয় হয়ে গেলো। তারিকের

মার তুমুল মাথা ধরে একদিন প্রচণ্ড জ্বর এলো এবং তার দু'একদিনের ভেতরেই তার সারা মুখে ও গায়ে দানা ছড়িয়ে পড়লো।

ডাক্তার বললো: প্রধানতঃ পানি-বসন্ত তবে কয়েকটা আসল বসন্তেরও দানা আছে। সতর্ক থাকতে হবে আর রুগীকে মশারীর ভেতর সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে হবে—বাচ্চারা কোনোমতেই সে কামরায় যেন না যায়। নার্স একটা পেলে ভালো।

—আপনার খোঁজে কোনো নার্স আছে না-কি ডাক্তার সাহেব? অসহায় ও কাতর স্বরে মোনায়েম জিজ্ঞেস করে।

—এখানে নার্স পাওয়া বড় মুশকিল। তবে খোঁজ করে দেখতে পারেন। বলে ফি নিয়ে ডাক্তার বিদায় হন।

তারিক তার মায়ের কামরায় না যাওয়ার নিষেধ কিছুতেই মানতে চায় না, বলে: কি, আমার মায়ের অসুখ করেছে আর আমি যাবো না। ডাক্তার ব্যাটাকে ডাণ্ডা দিয়ে মারবো। মোনায়েম ছেলেকে বুঝাবার চেষ্টা করে: না বাবা, মায়ের কাছে এখন যেতে নেই।

—আমি তোমাকে ভালোবাসি না, আম্মাকে ভালোবাসি। আমাকে আম্মার কাছে যেতে দেও না, শুয়োর কোথাকার। তারিকের কথায় তার শিশু-চিত্তের সমস্ত সঞ্চিত রোষ জমাট বেঁধেছে।

খালেদা কিন্তু বাপের পক্ষ নেয়: ছি ভাইয়া, দেখো না আব্বাকে এখন কত খাটতে হচ্ছে, চলো আমরা খেলা করি গিয়ে।

তার জবাবে তারিক কিন্তু সহসা ফুঁপিয়ে আর গরজিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে খালেদাও।

সব মিলে বেশ ডামাডোল-এ পড়ে মোনায়েম। যে বুড়ী ঠিকে কাজ করতো তাকে ধরলো: তোমার মার পানি-বসন্ত হয়েছে। যে কয়দিন তার অসুখ না সারে, তোমার মাকে দেখাশুনা করতে পারবে?

—তা পারবো না কেন। বুড়ীর সোজা জবাব।

—ছোঁয়াচে রোগ তো ? মোনায়েম বুড়ীকে এ-কথা জানালো নিজের কর্তব্য মনে করে।

—তাতে কি হয়েছে, আমার মেয়ের তো হয়েছিলো। তাই বলে কি তার আর দেখাশুনো করি নেই।

বুড়ীর দিকেও মোনায়েম নতুন বোধনের দৃষ্টিতে চায়।

বাস্তবিকই, বুড়ী যে-কয়দিন তার পেরে তারিকের নানা-নানী না এলেন, সে কয়দিন তারিকের মার জন্য বিনা বলায় যা করলো, কোনো মা নিজের মেয়ের জন্য তার চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে না। সময়মতো তারিকের মাকে তার ওষুধ ও পথ্য খাওয়ানো, তার কাপড় বদলিয়ে ও ধুয়ে তারিক ও খালেদাকে দেখাশুনা করা—সব কিছুই একমাত্র তারই পরিশ্রম ও যত্নে আঞ্জাম হয়ে গেলো।

মোনায়েম চুপ করে এ-সব দেখে আর ভাবে এখানে এসে যাদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, তাদের কেউ তো তার এই মুসিবত-এর খবর পেয়েও তারিকের মাকে একবার দেখতে এলো না। ঠিক কেন এমন হয় ?

তারিকের নানী আসাতে বুড়ীর কাজ কিছুটা লাঘব হলেও তারিকের মার পরিচর্যায় তার বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখা যায় না। আগেকার মতোই যত্নের সঙ্গে তারিকের মার সব খুঁটিনাটি দরকারের দিকে সে তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি রাখে; খালেদা ও তারিকের ভার অবশ্য তাদের নানীই নেন।

মোনায়েমকে তারিকের মা এক সময় বলে : তুমি আমার কাছে আর বেশী এসো না, রোগটা বড় ছোঁয়াচে।

মোনায়েম মৃদু হেসে বলে : তা বটে। তবে বুড়ী বা আম্মারও তো সে ভয় থাকতে পারে।

—বুড়ী আমার জন্য যা করলো তা ভুলবার নয়। তারিকের মার চোখটা ছলছলিয়ে ওঠে।

—সেটা ঠিক, তবে এই জনের কথাও ভুলো না। মোনায়েম নিজের আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে দেয়।

ম্লান হেসে তারিকের মা বলে : এর পর তো আর আমার দিকে ফিরেও চাইবে না, চেহারার যা দশা হবে।

—ফিরে না চাইলেও চাইবো তো বটেই। লঘু পরিহাসের ধরনে মোনায়েম কথাগুলো বলে। এমন সময় তারিকের নানী কামরায় ঢোকেন।

তারিকের নানা-নানী চলে যাওয়ার পর একদিন অফিসে গিয়ে মোনায়েম শুনলো, সপ্তাহ খানেকের ভেতরই মোনায়েমকে বদলী হয়ে বরিশাল যেতে হবে। এ-এক নতুন ভাবনা। তারিকের মার শরীর উন্নতির দিকে গেলেও এতো শীগগির তাকে স্থানান্তর করা যাবে কি না, বলা মুশ্‌কিল। আর এখানে এমন কেনো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব নেই, যার ওখানে কয়েকদিনের জন্যও তারিকের মাকে রেখে যাওয়া যায়।

বিকেলে রব্বানী এসে বলে : হুজুর নাকি বদলী হয়ে চলে যাচ্ছেন ?

—তাই তো শুনছি। নানা ভাবনা মনের মধ্যে আনাগোনা করলেও মুখের কোনো ভাবান্তর না করে মোনায়েম জবাব দেয়।

—হায়, খোদা ! রব্বানীর মুখে ওই দুটি কথা বিলাপের মতো শোনায়।

তোমার দরখাস্তের কি হলো ? মোনায়েম জিজ্ঞেস করে।

—লিখে এনেছি হুজুর, তবে শুনছি বেশীর ভাগ কেরানীই কিছু দেবে না। বলে নাকি যে, বুড়ো হজ্ব করতে যাবে তো আমরা টাকা দেবো কেন। কিন্তু মানত যখন করেছি হুজুর, যেমন করেই হোক যাবো। বাঁচবো না তো আর বেশী দিন, বউ বলেছে, টাকার কমতি হলে নিজের গয়না বিক্রী করে টাকা জোগাড় করে দেবে।

—ফিরে এসে যখন চাকরী থাকবে না বা অসুখে-বিসুখে পড়বে, তখন টাকা পাবে কোথায় ? ভেবে দেখো সব টাকা খরচ করে হজ্ব করতে যাবে কি না। মোনায়েম পাকা সংসারীর মতো কথা বলে।

কথাগুলো বুড়ীর কানে গেলো। কোথ্যেকে ছুটে এসে আতপ্ত মুখে বলে : না বাবা, হজ্ব করতে যাবে বলে মানত করেছে, মানা করতে নেই। ফিরে এলে খোদাই ব্যবস্থা করে দেবে। মোনায়েম চুপ করে যায়। রব্বানীর দিকে চেয়ে দেখে বুড়ীর মুখের আতপ্তভাব তার মুখেও এক আভা এনে দিয়েছে।

মক্কা মোয়াজ্জেমা, মদিনা শরীফ, রসুল খুদা, কাবা সব মিলে ব্যাধি-কাতর রব্বানীর ঘোলাটে চোখেও নতুন এক খোয়াবের দীপ্তি দিয়েছে। অনড় ঈমানের এক ঝিলিক।

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙবার পর মোনায়েম বুড়ীর ব্যবহার দেখে তাজ্জব বনে যায়। তার ছোটো ছেলে—যে একটু বোকা—কি এক খবর আনবার পর আহতা নাগিনীর মতো বুড়ী নিজের বিছানা ছেড়ে উঠে আর ক্ষিপ্র পদক্ষেপে বাইরে বেরিয়ে যায়। তারপর টলতে টলতে ফিরে এসে মাদুর ও কাঁথা গুটিয়ে নেয়—আবার গর্জাতে গর্জাতে বেরিয়ে যায়।

মশারীর ভেতর থেকে শঙ্কিত স্বরে তারিকের মা জিজ্ঞেস করে : কি হলো বুড়ী তোমার ?

—কি হয়েছে ? মোনায়েমও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

কারুর কথার কোনো জবাব না দিয়ে ছেলের সঙ্গে বুড়ী দিশেহারার মতো কোথায় বেরিয়ে যায়। অফিসের সময় হয়ে গেলেও বুড়ী আর ফেরে না।

মোনায়েম তারিকের মাকে জিজ্ঞেস করে : আজকে আমি অফিসে গেলে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো ?

—আমার আবার কি অসুবিধে, এখন তো ভালোই আছি। বুড়ীর কি হলো তাই ভাবছি।

—কি জানি আমিও তো বুঝতে পারছি না। ফিরে এসে শোনা যাবে। তুমি কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠো না, খবরদার। বলে মোনায়েম তারিকের মার দিকে লোলায়েম দৃষ্টিতে চেয়ে অফিসের দিকে পা বাড়ায়।

সেখানে কয়েকটা 'কেস' সেরে বেলা তিনটে নাগাদ মোনায়েম নিজের কামরায় বসে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করছে, এমন সময় রব্বানী এসে বলে : বুড়ী তো হুজুর এখানে এসে কাঁদাকাটি করা আরম্ভ করে দিয়েছে।

—কেন ?

—তার ছেলেকে পুলিশে ধরেছে।

—কি করেছিলো সে ?

—কোনো একটা দারোগার চাকরের সঙ্গে তার নাকি পাওনা টাকা নিয়ে বচসা হয়েছিলো।

—আদালতে আজকে তাকে হাজির করেছিলো ?

—করেছিলো হুজুর।

—কার আদালতে ?

—সেকেণ্ড অফিসারের।

বুড়ীর ছেলের নাম জেনে সেকেণ্ড অফিসারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেলো যে, তাকে পুলিশ ডাকাতির 'চার্জ'-এ ফেলেছে—বেইল' দেওয়া মুশকিল।

—দেখবেন যদি পারেন, দিয়ে দিয়েন। তার মা বেচারী বড় কাঁদাকাটি করছে। অনেকটা নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেকেণ্ড অফিসারের কাছে মোনায়েম অনুরোধ জানায়।

রব্বানী বলে : বুড়ীর সব টাকা হুজুর মোক্তার-এ নিয়ে নিয়েছে। ছেলেকে ছাড়াতে পারে নি বলে সে বড় কাঁদছে।

এবার বেশ বিরক্ত হয়ে মোনায়েম বলে : তার আমি কি করবো। আমাকে জিজ্ঞেস করে মোক্তারের কাছে এসেছিলো ? আর আইন ভাঙলে তো সাজা হবেই।

সাহস সঞ্চয় করে রব্বানী তাও বলে : না হুজুর। ঐ-পুলিশের কসাদী, ইচ্ছে করে তারা এ-রকম অনেককে হয়রান করে। বুড়ী বেচারীর আর কেউ নেই হুজুর।

মোনায়েম অনেকটা অস্বস্তি ধরনে রব্বানীকে বলে : যে-হাকিমের আদালতে এর বিচার হবে, তিনি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কেউ কিছু করতে পারবেন না। ও যদি কোনো আইন না ভেঙ্গে থাকে তো খালাস হয়ে যাবে। আর এ-ছেলের জন্য বুড়ীরই বা এত মাথাব্যথা কেন, সে তো কোনো দিন মায়ের খোঁজ নেয় না শুনেছি।

—মায়ের প্রাণ তো হুজুর, ওসব কথা কি আর মনে রাখে!

রব্বানীর এ-কথার পর মোনায়েমের মুখে আর কোনো কথা জোগায় না।

বদলী শেষ পর্যন্ত হলোই। 'চার্জ' দেওয়ার পর দু'তিন দিন মোনায়েম এক মুহূর্তের বিশ্রাম পায় নি। তারিকের মার দিকেও তেমন নজর দিতে পারে নি—সে অভাবটা অবশ্য বুড়ী পুরিয়ে রেখেছে। খোদার লাখো শুক্রিয়া তারিকের মা এখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে—যদিও দুর্বলতা পুরোপুরি কাটেনি।

যাবার দিনে ঘরের আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে উঠলো। খালেদা বুড়ীকে বলে : চলোনা বুড়ী তুমি আমাদের সঙ্গে।

—তা এখানে ছেলে মেয়ে থুয়ে কি করে যাই—তারপর খালেদার বাপের দিকে তাকিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে বলে—আমার ছেলের জন্য একটু বলে দাও বাবা, খোদা তোমার ভালো করবেন।

—ভেবো না তুমি বুড়ী। বলে গেছি, তোমার ছেলেকে ছেড়ে দেবে। বাধ্য হয়ে শেষের কথাটা মোনায়েমকে মিথ্যেই বলতে হয়।

রব্বানী মালটাল সব উঠিয়ে স্তব্ধ মুখে মুনিবের সামনে এসে দাঁড়ায়। তাকে পাঁচ টাকার এক নোট দিয়ে মোনায়েম বলে : তুমি হজ্ব-এ যেতে মানত করেছো, সেজন্য এই পাঁচটা টাকা দিয়ে গেলাম। বেশী আর পারলাম না। আমার নিজের হাতে এখন কোনো টাকা নেই।

ভারী গলায় রব্বানী বলে : তা থাকবে কি করে হুজুর। মার অসুখে যা দেদার খরচা হয়েছে। তারিকের মা বুড়ী থেকে বিদেয় নিচ্ছে : দোয়া করো বুড়ী আর মনে রেখো।

—তা আর মনে রাখবো না মা। তুমি আমার মেয়ের মতো ছিলে। তার পরনে তারিকের মার দেওয়া প্রায় নতুন এক শাড়ী। তারিকের মা গাড়ীতে উঠতে যাবে এমন সময় কিছুক্ষণের জন্য রব্বানী ও বুড়ী একত্রিত হয়। রব্বানী বলে ঃ ভেবো না আবদুলের মা। সাহেব বলে গেছে, তোমার ছেলেকে ছেড়ে দেবে। আর টাকা-পয়সার যদি দরকার হয় আমার কাছ থেকে নিও।

—তোমার কাছ থেকে কেন নিতে যাবো গো, হজ্ব করতে যেতে তোমার নিজের কত টাকা লাগবে। কথাগুলি মোনায়েমের কানেও পৌঁছায় এবং বেশ চমক খায় সে।

তারিকের মার অসুখ ও বদলীর ঝক্কি—এ-দুটি অপ্রত্যাশিত জিনিস মিলে তাকে এ-কয়দিন নিজের বাইরে তাকাবার অবসর দেয়নি। আজকে রাজশাহী ছেড়ে যাওয়ার মুখে রব্বানী ও বুড়ী দু'জনেই তাকে মানবতার খেলায় পরিষ্কার হারিয়ে দেয়।

আর সে কথা বুঝে নিজের প্রতি সহসা গভীর ধিক্কারে তার মন ভরে যায়। বদলে সে কি দিলো? রব্বানীকে পাঁচ টাকা বখশিস আর বুড়ীকে সাংঘাতিক এক ফাঁকি। তার আশ্বাসের কথা মনে করেই বুড়ী হয়তো এই ভরসা নিয়ে বসে থাকবে যে, তার ছেলেকে হাকিম দু'এক দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে।

সেকেণ্ড অফিসারের পক্ষে সেটা যদি সম্ভব না হয়।

তখন বুড়ী কি করবে—আর রব্বানীরও বা তার 'হুজুর' সম্বন্ধে মনে কি ধারণা হবে, সে-কথা ভাবতে অবশ্য মোনায়েমের এখন ভয় নেই। তবুও রিক্শায় যখন সম্পূর্ণ-নিরাময়-হয়ে-যাওয়া তারিকের মার পাশে সে বসলো, তখন শেষবারের মতো রব্বানী ও বুড়ীর ব্যথাতুর মুখের দিকে চেয়ে এক অপরাধের ভারে হাকিম মোনায়েমের মনটা খচ্ করে উঠলো।